শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৩৭২

প্রকাশক :
ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদশিল্পী :
রবীন দত্ত

মুদ্রাকর :
পশুপতি দে
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা-৩৭

উৎসর্গ

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়

প্রীতিভাজনেষু

এই লেখকের লেখা

কয়েকখানি উপন্যাস

তারার আলোর প্রদীপখানি   মৌনমন

আরও আলো   আয় চাঁদ   একটি আশ্বাস

মণিপদ্ম   তুঙ্গভদ্রা   মেঘ   রূপম্?

ভ্রমণকাহিনীর সংকলন

শতবর্ষের পথযাত্রা

শাশ্বত ভারত

১. দেবতার কথা   ২. ঋষির কথা   ৩. অসুরের কথা

রম্যাণি বীক্ষ্য

ছোটদের জন্য

আমাদের দেশ

১. উড়িষ্যা   ২. অন্ধ্র

এক

এবারে শুধু বিশ্রামের জন্যেই আলমোড়ায় এসেছিলাম, তার বেশি কোন বাসনা মনে ছিল না। বাঙলা দেশে গ্রীষ্ম শেষ হয়ে বর্ষা নেমেছে, কিন্তু গরম কমে নি। এবারে গরম না কমলে দেশে ফিরব না বলে সঙ্কল্প করেছি।

অপরাহ্ণে বেড়াতে বেরিয়ে রামকৃষ্ণ কুটীরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেখানে দেখলাম কৈলাস যাত্রার উদ্যোগ আয়োজন। ভারতের নানা প্রান্ত থেকে যাত্রীরা এসে সমবেত হচ্ছেন, শহরের নানা স্থানে এই সমাবেশ। একজন বাঙালী আমাকে প্রশ্ন করলেন: আপনি কি কৈলাস যাত্রী নাকি?

আমি সংক্ষেপে বললাম: না।

একজন তরুণ লামা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে দেখিয়ে ভদ্রলোক বললেন: ইনিও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন। তবে কৈলাসে নয়, মানস সরোবরে। মানসকে এঁরা সকল তীর্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাবেন।

আমি বললাম: সত্যি নাকি!

লামা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। ভারি সুন্দর প্রসন্ন হাসি, শিশুসুলভ সরলতায় ভরা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: বাঙলা বোঝেন বুঝি?

উত্তর দিলেন বাঙালী ভদ্রলোক, বললেন: হিন্দী বোঝেন, বলতেও শিখেছেন। কিছুদিন আগে নিজের দেশ থেকে পালিয়ে এসে এ দেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এবারে তীর্থ করতে যাচ্ছেন আমাদের সঙ্গে।

লামা যেন সবই বুঝতে পেরেছে, এমনি ভাবে মাথা নাড়ল। মুখে তেমনি সুন্দর সরল হাসি।

আমি তাঁদের নমস্কার করে ফিরে আসছিলাম। ভদ্রলোক বললেন: কোথায় উঠেছেন?

বললাম: হোটেলে।

একা?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

অল্প দিন থাকবেন বুঝি!

বললাম: যত দিন ভাল লাগে, তত দিন থাকব।

ভদ্রলোক এবারে বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠলেন, বললেন: তবে চলুন না আমাদের সঙ্গে। ফেরার যখন তাড়া নেই, তখন একা বসে থেকে করবেন কী!

কথাটা মিথ্যা নয়। বসে বসে লেখাপড়া ছাড়া আর কিছু করবার নেই। বললাম: বিশ্রামের জন্যে এসেছি, কিছু করবার নেই বলে বিশ্রামটা ভাল হবে।

বলে আমি বিদায় নিয়ে ফিরে এলাম।

পথে আর একদল কৈলাস যাত্রীকে দেখলাম। তাঁরা বাজারে পরম উৎসাহে পাহাড়ে ওঠার সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করছেন। বিশেষ ধরনের জুতো, লম্বা ছড়ি, ওয়াটারপ্রুফ, কাপড, ইত্যাদি। নানা রকমের কথা হচ্ছে তাঁদের মধ্যে। তিব্বতের রুক্ষ ও ঠাণ্ডা হাওয়ায় নাক-মুখ ফেটে রক্ত বেরিয়ে পড়ে। তার জন্যে ভাল ক্রীম বা ভেসেলিন দরকার। বরফের উপর উজ্জ্বল আলোয় চোখ যায় ধাঁধিয়ে, সঙ্গে গগল্‌স্‌ থাকলে চোখ বাঁচে। কেউ পরামর্শ দিচ্ছেন, কেউ নিচ্ছেন। সাংসারিক যাঁরা, তাঁরা পথের খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহে ব্যস্ত।

দুজন বাঙালীকেও দেখলাম। শক্ত-সমর্থ চেহারার মাঝবয়সী

ভদ্রলোক। তাঁদের একজন আমাকে বাঙালী বলে চিনতে পারলেন। বললেন: কি মশায়, আপনার ব্যবস্থা সব পাকা হয়ে গেছে?

কিসের ব্যবস্থা?

কেন, আপনি কৈলাস যাচ্ছেন না?

আমি মাথা নেড়ে বললাম: না।

তাঁর সঙ্গী ভদ্রলোকও এবারে আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। এ সময়ে আলমোড়ায় এসে কৈলাসে যাচ্ছি না, এ যেন অবিশ্বাস্য কথা। কেন জানি না, একটু লজ্জা বোধ করে আমি কৈফিয়ৎ দিলাম: বিশ্রামের জন্যে এখানে এসেছি।

যে ভদ্রলোক আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি বললেন: তীর্থ করবার এমন সুযোগ জীবনে কম আসে, ভাল করে ভেবে দেখবেন।

বলে নিজেদের কাজে মন দিলেন।

আরও বিস্ময় আমার জন্য সঞ্চিত ছিল। হোটেলে ফিরে দেখলাম যে পুরুষ ও নারীর একটি ছোটখাট দল কৈলাস যাত্রার মানসে এসে জুটেছেন। বাঙালী নন, কথাবার্তা বলছেন হিন্দুস্থানীতে। নানা বয়সের মেয়ে-পুরুষ, কিন্তু বয়সে প্রবীণ কেউ নন। সাজসজ্জায় তীর্থযাত্রী বলে মনে হয় না, ইংরেজীতে যাকে টুরিস্ট বলে সেই রকমই আচরণ। এক ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন: গুড ইভনিং, আমার নাম ধীর।

প্রতি-নমস্কার করে আমি নিজের নাম বললাম।

মিস্টার ধীর আনন্দ প্রকাশ করে দলের আর সকলের সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন। মিসেস ধীর ও মিস ধীর। মিস্টার ও মিসেস মাথুর। বুঝতে কষ্ট হল না যে এই দুই পরিবারের মধ্যে পুরাতন প্রীতির সম্পর্ক। ধীর পরিবার উদ্বাস্তু পাঞ্জাবী, বর্তমান বাস দিল্লীতে। মাথুর পরিবার উত্তরপ্রদেশবাসী, কিন্তু কর্মোপলক্ষে

দিল্লীতেই থাকেন। তাঁরা মানস সরোবর ও কৈলাস দর্শনের জন্য দু মাস ছুটি নিয়ে এসেছেন। জীবনটা উপভোগ করে ফিরবেন।

মিস্টার মাথুর বললেন: এ বেশ ভালই হল, আমরা আর একজন সঙ্গী পেয়ে গেলাম।

মিসেস ধীর বললেন: আপনি যে কৈলাসে যাচ্ছেন, ম্যানেজার তো সে কথা বললেন না!

আমি সসঙ্কোচে বললাম: আমি কৈলাসে যাচ্ছি না বলেই ম্যানেজার সে কথা জানেন না।

সবাই যেন চমকে উঠলেন, বললেন: আপনি যাচ্ছেন না!

তারপরে মিস্টার ধীর একই মন্তব্য করলেন: এ একটা রিয়াল অ্যাডভেঞ্চার হত।

মিসেস ধীর বললেন: সবাই তোমাদের মতো নন তো। ঘরে বসে ছুটি ভোগ করতেও অনেকে ভালবাসেন।

রাতে আমি নিজের ঘরে বসে কৈলাস যাত্রার কথা ভাবছিলাম। এ দেশের অগণিত তীর্থকাম পর্যটকের স্বপ্ন মানস সরোবর ও কৈলাস। ভারতের সীমান্ত পেরিয়ে অজ্ঞাত দেশ তিব্বতে এই পবিত্র তীর্থ। পূর্বদিকে মানস সরোবর ব্রহ্মার মন থেকে উৎপন্ন। পশ্চিমে রাক্ষস তালের সৃষ্টি হয়েছে দশানন রাবণের স্বেদ বা অশ্রু থেকে। এই দুই হ্রদের মাঝখান দিয়ে গেছে দেবাদিদেব মহাদেবের লীলাভূমি কৈলাসের তুষারাবৃত পথ। কালিদাস এই কৈলাসের রূপ বর্ণনায় বলেছেন:

'ত্রিদশবনিতাদর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ।'

কবি নরেন্দ্র দেব তার অনুবাদ করলেন:

'অভ্রভেদী বিরাট গিরি তুষার পাতে দেখায় যেন,
দেবনারীদের প্রসাধনের দীপ্ত উজ্জ্বল মুকুর হেন।'

এই অপরূপ দৃশ্য আমরা মানসচক্ষে দেখি, সাহস পাই না এই

দুর্গম তীর্থ যাত্রার। কিন্তু দুর্গমতাকে মানুষ কোন দিন ভয় পায় নি। ভয়কে জয় করেছে প্রেমে, রূপের মায়ায় ও তীর্থের টানে। আমি যে যাত্রীদের দেখে এলাম, তাঁদের কেউ চলেছেন তীর্থের টানে, সৌন্দর্যের টানেও চলেছেন কেউ। আবার সঙ্গী হবার লোভেও হয়তো কেউ চলেছেন। আমার হৃদয়ে এতদিন কোন টান ছিল না, সহসা আজ যেন একটি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছি, গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছে মন।

আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের বর্ণনা থেকে মানস সরোবরের একটা ছবি আমি কল্পনা করে নিয়েছিলাম। ঘন নীল বিশাল জলরাশি দিগন্তের শুভ্র পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত, আর হংসয়োর্দম্পতি পরস্পরং প্রেম্না বিহরন্তৌ নিরন্তরম্। এরই নিকটে ধনপতি কুবেরের আলয়। তাঁর অবলারা এসে মানসের জলে চিরং বিহৃত্য সংস্নায় বটমূলে সমাশ্রয়ৎ।

কখন জানি না আমার মন চলে গেল সেই বিস্মৃতপ্রায় অতীতে। কুবেরের পুরললনাদের আমি মানসের তটে দেখতে পেলাম। চঞ্চল চরণে স্বর্ণনূপুরের নিক্কণ তুলে তাঁরা নেমে এলেন. তাঁদের পরিধেয় বসনে রামধনুর বর্ণাঢ্য, অঙ্গের আভরণ থেকে মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। বটমূলে বসন ত্যাগ করে তাঁরা জলে নামলেন।

হংসমিথুনেরা এই কন্যাদের দেখে ভয় পেল না। আবেগে উচ্ছল হয়ে কেলি করতে লাগল শীতল সলিলে। তাদের পক্ষপুটের আঘাতে তরঙ্গ উঠল বলয়ের মতো, আঘাত করল স্নানরতা কন্যাদের নিরাবরণ বুকে। সে তরঙ্গ তাঁরা কঙ্কণ-বলয়-শিঞ্জিত লীলায়িত বাহুর কোমল তাড়নায় ফিরিয়ে দিলেন।

তারপর?

তারপর চোখ ফিরিয়ে নিতে হয়। যে বৃদ্ধ বট আছে তটপ্রান্তে নির্বাক প্রহরীর মতো দিবারাত্রির সতর্ক প্রহরায়, কন্যারা উঠে এলেন

তারই ছায়ায়। যৌবনভারে গর্বিতা নারী ঝুরির আড়ালে দাঁড়িয়ে বেশবিন্যাস করবেন আর প্রসাধন করবেন তাঁদের ঘনকৃষ্ণ কেশদাম রৌদ্রে মেলে।

আজ হয়তো মানসের তটে সে বটগাছ নেই। কুবের কন্যাদের কলহাস্যে মুখর হয়ে ওঠে না তার তীরভূমি। ধনপতি কুবের আজ ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছেন, তাঁর নূতন পুরী রচনা করেছেন দেশান্তরে। যে ভারত একদিন তাঁকে তার আদর্শের জন্য সম্মান করে নি, সেই ভারতকে তিনি চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করে গেছেন। ভুখা ভারত আজ ক্ষুধায় কাঁদে।

কিন্তু তবু এই ভারত থেকে তীর্থযাত্রীর দল মানস সরোবরের পাশ দিয়ে আজও চলেছে কৈলাস দর্শনে, কৈলাসের প্রতি তাদের নাড়ির টান :—

'অসংখ্য তার শুভ্রশিখর কুমুদ ফুলের তুল্য সাদা,
শিবের যেন অট্টহাসি যুগযুগান্তে জমাট বাঁধা।'

কখন আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি নে। যখন ঘুম ভাঙল তখনও সূর্যোদয় হয় নি। গায়ে একখানা গরম চাদর জড়িয়ে দরজা খুলে আমি বাহিরে বেরিয়ে এলাম।

পৃথিবী জেগে উঠেছে, পাখির কলকাকলি শুনছি চারিদিকে। অন্ধকার ফিকে হয়ে গেছে, পুবের আকাশে দেখছি আলোর বিজ্ঞাপন। ভাল লাগল আলমোড়ার এই সকালটি। পরিচ্ছন্ন রাজপথে আমি পায়চারি করতে বেরলাম।

বেশিক্ষণ নয়, অল্পক্ষণ পরেই দু ধার থেকে এল দুজন।

আমাদের হোটেল থেকে বেরিয়ে এল মিস মায়া ধীর, বলল : আপনি এত সকালে ওঠেন !

আর পাশ দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল সেই তরুণ লামা,

নির্বাক বিস্ময়ে তাকাল আমাদের দুজনের মুখের দিকে, প্রসন্ন হাসিতে তার সারা মুখ ভরে গেল।

আমি দুজনের পরিচয় করে দিলাম। বললাম : আপনারা তো একই পথের যাত্রী, পথেই পরিচয় গভীর হবে।

মায়া ধীর বলল : আপনি যাবেন না কেন?

যাবার কথা আমি ভেবে দেখি নি.

লামা এবারে প্রথম কথা কইল, বলল : জরুর যায়েঙ্গে।

এ তার আশার কথা, না বিশ্বাসের, তা বলল না। কিন্তু আমার মনে হল যে এই তরুণ মানুষটি যেন আমার ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিল। তাই আরও বলল : পথে আপনাকে আমি অনেক কথা বলব, চলতে আপনার একটুও কষ্ট হবে না।

মায়া ধীর বলল : সত্যি কথা, পথ চলার আনন্দ আপনার কষ্টকে ছাপিয়ে যাবে।

আমি কোন উত্তর দিতে পারলাম না, আর তারাও কোন উত্তর চাইল না। আমার সম্মতি বুঝি তারা অনুভব করতে পেরেছিল।

দুই

হোটেলে ফিরে চায়ের টেবিলে মায়া ধীর কথাটা ঘোষণা করল, বলল : মিস্টার রায়ও কৈলাসে যাচ্ছেন। কথা দিয়েছেন তাঁর বন্ধু আমাকে।

মিসেস ধীর বললেন : সত্যি নাকি?

কিন্তু মিস্টার ধীর তাঁর বাঁ হাতের রুটিতে কামড় দিয়েছিলেন বলে কথা কইতে পারলেন না, উঠে এসে আমার দিকে তাঁর ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। আমি হাত বাড়াতেই প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করলেন। তারপর মুখের রুটির টুকরোটা সামলে বললেন : এই তো কাজের কথা।

মিস্টার মাথুর বললেন : সঙ্গে নেবার জিনিসপত্র সব আছে তো, না সংগ্রহ করতে হবে?

মিসেস মাথুর বললেন : সঙ্গে আর থাকবে কী করে, সবই এখানে যোগাড় করতে হবে।

মিস্টার ধীর নিজের চেয়ারে এসে বসে বললেন : কুছ পরোয়া নেহি। আমাদের দলে যখন যোগ দিয়েছেন, তখন আমিই সব ভার নিচ্ছি।

মিস্টার মাথুরের কথায় জানলাম যে মিস্টার ধীর এই দলের লীডার এবং কৈলাসের পথে সবাইকে তাঁর হুকুম মেনে চলতে হবে। বললেন : রাজী?

আমি উঠে দাঁড়িয়ে দরবারী কায়দায় তিনবার সেলাম করলাম।

মিস্টার ধীর প্রবলকণ্ঠে হেসে উঠে বললেন : বান্দা আকলমন্দ হ্যায়, ইনকো ইনাম দেও শ—

জুতো বলো না যেন।

বলে মায়া ধীর খিলখিল করে হেসে উঠল!

এই পরিহাসেই আমি এঁদের দলভুক্ত হয়ে গেলাম।

আলমোড়া থেকেই আজকাল পদযাত্রা শুরু হয় না। আসকোট নামে একটা শহর পর্যন্ত বাস যাতায়াত করে শুনেছি। কৈলাস যাত্রীরা ট্রেনে চেপে কেউ টনকপুরে এসে নামেন, কেউ আসেন কাঠগোদাম স্টেশনে। টনকপুর নেপাল সীমান্তের একটি ছোট শহর। সেখান থেকে পিথোরাগড়ের বাস চলে চম্পাবতের উপর দিয়ে। কাঠগোদাম থেকে আলমোড়ার বাস আছে, আবার আলমোড়া থেকেও পিথোরাগড়ে বাস চলাচল করে। পিথোরাগড় থেকে আসকোটের দূরত্ব অল্প। একেবারে নেপাল সীমান্তে এই শহর। এর পরেও সীমান্ত বরাবর পথ গেছে উত্তরে লিপুলেক পাসের দিকে। এই গিরিবর্ত্ম চিরতুষারাবৃত। জ্যৈষ্ঠের শেষে বরফ গলতে শুরু করে, তখন শুরু হয় মানুষের যাতায়াত। ভেড়া ও টাট্টুর পিছনে পাহাড়ী বণিকেরা যায় তিব্বতে বাণিজ্যের জন্যে। লিপুলেক পাস পেরলেই তিব্বত। গুরেলা মান্ধাতা হয়ে মানস সরোবর ও রাক্ষস তালের মাঝখান দিয়ে কৈলাসের পথ। পথের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমি মানচিত্রে পেয়েছি। মানস সরোবর ও কৈলাস যাত্রার ভ্রমণ-কাহিনী পড়েছি দুখানা। সে অনেক দিন আগে। অনেক দিনের পুরনো কাহিনী। সে সব কথা এখন আর ভাল মনে নেই।

মিস্টার ধীর অ্যাণ্ড পার্টি তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লেন। বললেন: আসুন, একটু খবর সংগ্রহ করে আসা যাক।

আমি বললাম: সেই সঙ্গে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও কিনতে হবে।

মিস্টার ধীর মাথা নেড়ে বললেন: উহুঁ, সে লীডারের ভাবনা। দলে যখন নাম লিখিয়েছেন, তখন আর দায়িত্ব কিছু নেই।

আমিও মাথা নেড়ে বললাম: উহুঁ, যতক্ষণ পর্যন্ত এইটে সমর্পণ না করছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আছে।

বলে নিজের টাকার থলিটি মিস্টার ধীরের দিকে বাড়িয়ে দিলাম।

মিস্টার ধীর হাত বাড়ালেন না, বললেন: ও এখন আপনার কাছেই থাকবে।

মিস্টার মাথুর বলে উঠলেন: এ রকম একচোখোমি কেন! আমাদের সবাইকে তো আগাম দিতে হয়েছে!

মিস্টার ধীর গম্ভীর ভাবে বললেন: খরচ পাঁচ ভাগের বদলে ছ ভাগ হবে। আগে সেই হিসেব করে পরে আগামের কথা।

মায়া ধীর বলল: অঙ্ক ভুল হল। খরচ ছ ভাগ হবে, কিন্তু পাঁচ জনের খরচ ছ ভাগ হবে না। ওঁরও এখন সমান ভাগ দিতে হবে। পরে ছ ভাগের হিস্যা।

মিস্টার ধীর অগ্রসর হয়ে বললেন: সে হোটেলে ফিরবার পরে, এখন নয়।

আমি বললাম: কাজটা কিন্তু আপনারা ভাল করলেন না। অজ্ঞাতকুলশীল এক সঙ্গীকে নিয়ে পথে বিপদ না হয়।

মিস্টার ধীর তৎক্ষণাৎ তাঁর কোমর থেকে একটা রিভলবার বার করে দেখালেন। আর সেই সঙ্গে মিস্টার মাথুরের কোমরটাও দেখিয়ে দিলেন। বললেন: যে পথে যাচ্ছি, সে পথে এ সবের দরকার আছে।

মিসেস মাথুর হেসে বললেন: আপনার পরিচয় ভাল করে না জেনে শুনে আমরা আপনাকে সঙ্গে নিই নি। ভুল করে হোটেলের ম্যানেজারকে আপনি বোধ হয় নিজের পরিচয়টা দিয়ে ফেলেছিলেন।

মায়া ধীর সহাস্যে বলল: আমাদের নামধাম নোট করে নেবেন।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা রামকৃষ্ণ কুটীরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। স্বামীজীদের সঙ্গে কথা বললে যে সমস্ত খবর পাওয়া যাবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের এই যাত্রার উদ্দেশ্য শুনে একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী একটু দমে গেলেন, বললেন: আপনারা কি এত কষ্ট স্বীকার করতে পারবেন?

কেন পারব না?

তিনি বললেন : কৈলাসের পথ অন্য কোন পাহাড়ী পথের মতো নয়, একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির পথ। কখনও চড়াই উঠবেন একটানা পাঁচ-সাত মাইল, আবার উৎরাই ঠিক অতটাই পথ। পাশাপাশি দুজনে যেতে পারবেন না, স্থানে স্থানে এমনই সঙ্কীর্ণ যে একা যেতেই ভয় করবে। যেখানে ঝর্ণার জল নামছে, সেখানে শ্যাওলায় পিছল হয়ে আছে, একটু পা হড়কালেই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। দিনে চোদ্দ-পনর মাইল করে এই দুর্গম পথে হাঁটতে হবে। শুধু দেহের শক্তি নয়, বুকেও সাহস চাই।

মিস্টার ধীর বললেন : দুইই আমাদের আছে।

স্বামীজী তারপর মহিলাদের দিকে তাকিয়ে বললেন : আপনাদের কষ্টের সীমা থাকবে না। সারা পথ ডাণ্ডিতে যেতে পারবেন না, ঘোড়াতেও না। কখনও হাঁটতে হবে, কখনও সতরঞ্চির ঝোলায় বসতে হবে, আবার কখনও মানুষের পিঠে চেপেও দু-একটা দুর্গম স্থান অতিক্রম করতে হবে। পারবেন এত কষ্ট করতে ?

মিসেস ধীর বললেন : সত্যি কথা।

কিন্তু মিসেস মাথুর প্রতিবাদ করে বললেন : কেন পারব না !

মায়া ধীর সকৌতুকে বলল : মিস্টার মাথুর পারবেন তো ?

মিস্টার মাথুর একটু রুষ্ট ভাবে বললেন : পড়েছি যবনের হাতে—

মায়া ধীরের মৃদু হাসি ছাপিয়ে দিল মিস্টার ধীরের উদ্দাম হাসি।

আমার বুঝতে বাকি রইল না যে এই যাত্রী দলের তিন জনের উৎসাহে অন্য দুজন আসতে বাধ্য হয়েছেন। দুর্গম পথের ভয় এখনও তাঁদের দূর হয় নি।

স্বামীজী বললেন : আপনারা তীর্থযাত্রী হলে আপনাদের আমি নিরুৎসাহ করতাম না। দেবতার টান এমনই নিবিড় যে পথের কষ্টকেও আনন্দ মনে হয়, আর ভয় দূর হয় দেবতার নামে। 'জয় শঙ্করজীকি জয়' বলতে বলতে অগণিত তীর্থযাত্রী এই পথেই নিত্য যাতায়াত করে আনন্দে নির্ভীক চিত্তে।

আমি বললাম : দেবতা তো সত্য ও সৌন্দর্যেরই প্রতীক।

স্বামীজী আমার কথা মেনে নিলেন, বললেন : 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'।

আর একজন তরুণ স্বামীজী আমাদের উৎসাহ দিলেন। বললেন : কষ্ট ভাবলেই কষ্ট, তা না হলে কষ্ট কিসের! মনটাই হল আসল, মনে আনন্দ থাকলে বাইরের কষ্ট কোন দিন মানুষকে ছোট করতে পারে না। তবে হ্যাঁ, ও পথে অনেক জিনিসের অভাব আছে। সেগুলো সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

এই বলে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের একটা লম্বা ফিরিস্তি তিনি দিলেন। রাত্রিবাসের জন্য তাঁবু সঙ্গে নিতেই হবে। পথে চটি সরাই বা ধর্মশালা নেই। কোন কোন গ্রামে যদি বা আশ্রয় পাওয়া যায় তো সেই পরিবেশে রাত কাটানো প্রায় অসম্ভব। নোংরামি আর দুর্গন্ধই তার প্রধান কারণ। তারপর সঙ্গে প্রচুর শীতবস্ত্র চাই। শুধু গরম জামা-কাপড় নয়. মাথায় টুপি, গলায় মাফলার, হাতে দস্তানা এবং পায়ে মোজার উপরে লপেটা মানে গরম কাপড়ের পট্টি। শোবার জন্যে লেপ কম্বল দুইই। পোশাকপত্র দু সেট চাই, কেননা কখন বৃষ্টি হবে পাহাড়ে তার কোন ঠিক নেই। মাঝে মাঝে ভিজতেই হবে। সঙ্গে ছাতা আর ওয়াটারপ্রুফ থাকলে উপরের দিকটা বাঁচানো যায়। কিন্তু নিচের দিক বাঁচে না। উপরের দিক ভিজলে আরও কেলেঙ্কারী, শীতে একেবারে জমে যেতে হবে। বিছানাপত্র ও খাবার জিনিসের বোঝা বাঁচাবার জন্যেও ওয়াটারপ্রুফ বা অয়েলক্লথ জাতীয় জিনিস সঙ্গে রাখতে হবে। এর পরে খাবার জিনিসের কথা।

ভারতের সীমানা লিপুলেক পাসের এধারে গার্বিয়াং আর ওধারে তাক্লাকোট। এই পর্যন্তই খাদ্যদ্রব্য কিছু কিছু পাওয়া যায়। ঘি

আটা গুড় নতুন চাল আর মসুর ডাল। অন্যান্য জিনিস সঙ্গে নিতে হয়। নিরামিষাশীর জন্যে খুব প্রয়োজনায় হল টক-ঝাল আচার, শুকনো মেওয়া ফল বাদাম পেস্তা আখরোট কিসমিস, ডালমুট বিস্কুট চা। স্টোভ স্পিরিট লণ্ঠন কেরোসিন টর্চ ব্যাটারি মোমবাতি দেশলাই হাল্কা বাসন প্রভৃতি যাবতীয় রান্নার ও বাতি জ্বেলে কাজ করবার জিনিস।

মিস্টার ধীর বললেন: এ সবের ভাবনা আমাদের নেই। সঙ্গে আমাদের খানসামা যাবে। তার ওপরেই সব ভার দিয়ে দিয়েছি।

স্বামীজী বললেন: একবার তবু দেখে নেবেন, পরে যাতে পস্তাতে না হয়। আর একটা দরকারী জিনিস হল একটা ওষুধের বাক্স। যাত্রীদের মধ্যে কোন ডাক্তার না থাকলে নিজেদের চিকিৎসা নিজেদেরই করতে হবে।

মিসেস মাথুর বললেন: একটা ফাস্ট এইড বক্স আমরা সঙ্গে এনেছি।

স্বামীজী বললেন: ওর ভেতর জ্বরের ও পেটের অসুখের ওষুধ, মাথাধরার বড়ি, পায়ে বেদনার মালিশ, ঘায়ের মলম, মুখে মাখবার ক্রীম প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি আছে কি না ভাল করে দেখে নেবেন।

তারপরে জিজ্ঞাসা করলেন: চোখ বাঁচাবার জন্যে কালো চশমা কিনে নিয়েছেন তো?

মায়া ধীর বলল: শুধু মিস্টার রায়ের জন্যে এক জোড়া চশমা কিনতে হবে।

তিনি বললেন: তার সময় আছে। যাত্রীরা এখান থেকে পরশু যাত্রা করছেন। আজ রাত্রে একবার আলোচনা করবেন যে কী কী না হলে দু মাস আপনাদের চলে না। সেই সমস্ত জিনিস কাল কিনে নেবেন। তবে মনে রাখবেন যে যত জিনিস বাড়বে, ঘোড়া আর ঝব্বুর সংখ্যাও বাড়বে তত।

মিস্টার ধীর বললেন: বুঝেছি। কলম্বাসের মতো স্বাবলম্বী হয়ে আমাদের যাত্রা করতে হবে, কিন্তু সঙ্গে জাহাজ নেই।

স্বামীজী হেসে বললেন: ঠিক তাই।

তারপরে আমরা বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

তিন

মধ্যাহ্ন-ভোজের পর আমি একটু পায়চারি করতে পথে বেরিয়েছিলাম। সহসা আবার লামার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মনে হল, সকালে বেরিয়ে লামা এখন ফিরছে। বললাম: কী খবর লামাজী?

প্রসন্ন হাসিতে লামার মুখ ভরে গেল। বলল: আমার নাম টাশি থেনডুপ।

আমি বললাম: আপনি তো লামা, আপনাকে আমরা থেনডুপ লামা বলব।

না না, আমাকে শুধু থেনডুপই বলবেন, আমি আর লামা নই।

আমি হেসে বললাম: বিয়ে করেছেন বুঝি?

না।

তবে?

বড় বিষণ্ণ দেখাল লামার দৃষ্টি। বলল: আমি আর গোম্ফায় থাকি না, গোম্ফা থেকে বেরিয়ে এসেছি।

কেন?

বেরিয়ে না এলে অন্য লামারা আমাকে বার করে দিতেন। কিংবা—

কিংবা কী?

খুন করে ফেলতেন আমাকে।

আমি পরম বিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম: কেন?

লামা হঠাৎ সংযত হয়ে গেল, বলল: না না, থাক সে কথা। সে আমার ব্যক্তিগত কথা। আমিই ভুল করেছিলাম, মরাই আমার উচিত ছিল।

বলে সামনের দিকে পা বাড়াল।

আমি অন্য দিকে যাচ্ছিলাম। এবারে পিছন ফিরে লামার

সঙ্গেই চলতে শুরু করলাম। আর কোন প্রশ্ন করলাম না তাঁকে। আমি বুঝতে পেরেছি যে এই তরুণ মানুষটির জীবনে একটা মস্ত বিপর্যয় ঘটে গেছে। সে কোন সুখের স্মৃতি নয়, সে এক বেদনার্ত কাহিনী। অসতর্ক মুহূর্তে লামা সেই দুঃখের ইঙ্গিত দিয়ে ফেলেছে, এর বেশি আর সে কিছু বলবে না। আমিও আর তাকে বিব্রত করতে চাইলাম না।

সুন্দর সুগঠিত দেহ এই থেনডুপ লামার। মুখের ফর্সা রঙে যেন আলতার ছোপ লেগেছে। ঢিলে আলখাল্লা কোমরে ফিতে দিয়ে বাঁধা, পায়ে বুট জুতো। আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে বয়স অনুমান করতে চাইলাম। চব্বিশ পঁচিশের বেশি হয়তো হবে না, কিন্তু চোদ্দ পনর বছরের কিশোরের মতো সরল হাসি-হাসি মুখ। এর অপরাধের কথা ভেবে আমি আশ্চর্য হলাম। এই বয়সে এমন কি অন্যায় করতে পারে যে তাকে গোম্ফা থেকে বেরিয়ে আসতে হল! তা না এলে অন্য লামারা তাকে খুন করত! লামা তো বুদ্ধের সেবক। তারাও মানুষ খুন করে। আমার মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন এক সঙ্গে জট পাকিয়ে উঠল। কিন্তু এই সামান্য পরিচয়ের মূলধন সম্বল করে সব কথা জানতে চাইবার সাহস আমার হল না।

চলতে চলতে লামা আমাকে জিজ্ঞাসা করল: আপনি কত দূর যাবেন?

আমি সত্যি কথাই বললাম: কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বের হই নি, আপনাকেই একটু এগিয়ে দিয়ে আসব।

কিছু বলবার জন্য লামা যেন দ্বিধা করছিল। তা লক্ষ্য করে আমি বললাম: কিছু বলবেন কি?

লামার দ্বিধা তবু দূর হল না। অনেক সঙ্কোচে বলল: আজ সকাল বেলায় যে মহিলাকে দেখলাম, তিনি আপনার—

প্রশ্নটা লামা শেষ করতে পারল না। তার আগেই আমি বললাম: কেউ নয়।

লামা আমার মুখের দিকে মুখ তুলে তাকাল। আমি তার দৃষ্টিতে বিস্ময় নয় ভয় দেখতে পেলাম। বললাম: কৈলাস যাবে বলে ওর দাদা ও বৌদির সঙ্গে আমাদের হোটেলে এসে উঠেছে।

লামা যে ভয় পেয়েছে, এবারে আমি তা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। কিন্তু তার কারণ বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম: কেন, তাতে ক্ষতি হয়েছে কিছু?

ক্ষতির কথা নয়।

তবে?

লামাকে বড় অন্যমনস্ক দেখাল, যেন হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে। দৃষ্টি তার দূরের পাহাড়ে গিয়ে নিবদ্ধ হয়েছে। আমি তাকে বাস্তব জগতে ফিরিয়ে আনবার কোন চেষ্টা করলাম না।

এক সময়ে সে নিজেই বলল: কোথায় যেন ছ্যাতেনের সঙ্গে একটা মিল দেখতে পেয়েছি।

আমি খুবই সন্তর্পণে প্রশ্ন করলাম: ছ্যাতেন কে?

লামা তেমনি অন্যমনস্ক ভাবে বলল: আমাদের গ্রামেরই একটি মেয়ে। বয়স ঐ রকমই হবে। কিন্তু কোথায় মিল তা ধরতে পারছি না।

আমি বললাম: নিশ্চয়ই কোথাও মিল আছে।

থেনডুপ লামা বুঝি তার নিজের গ্রামে চলে গেছে। ছ্যাতেনকে মনে করবার চেষ্টা করছে প্রাণপণে। ঠিক মনে পড়ছে না। সে হয়তো অনেক দিন আগের কথা। কত দিন হল সে তার গ্রাম ছেড়ে এসেছে, আমার সে কথা জানা নেই। তা জানবার জন্যে বললাম: আপনি কত দিন আগে এ দেশে এসেছেন?

লামা সংক্ষেপে বলল: বছর কয়েক আগে।

কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে আমার কৌতূহল মিটল না। আমার আরও কিছু জানবার ইচ্ছা। বললাম: দু-তিন বছর?

লামা বলল : বেশি। আমার বয়স তখন ঐ মেয়েটির মতো, যাকে আজ সকালে দেখলাম। ছ্যাতেনরও তখন ঐ বয়েস।

কথা বলতে বলতে আমরা তখন বাজার ছাড়িয়ে এসেছি। সামনে নন্দাদেবীর মন্দির। আমি বললাম : আসুন না, এই মন্দিরের প্রাঙ্গণে একটু বসি।

লামা আপত্তি করল না, আমাকে অনুসরণ করে মন্দিরে উঠে এল।

একটুখানি উঁচু জায়গায় এই মন্দির। দূরের পাহাড় দেখা যায় এক ধারে দাঁড়িয়ে। মন্দিরের দরজা বন্ধ। আমরা একটা চত্বরের উপরে পাশাপাশি বসলাম। তারপরে শুনলাম টাশি থেনডুপের জীবনের কথা। প্রথম দিনেই সব কথা সে আমাকে বলে নি, বলেছে একটু একটু করে, মানস সরোবরের পথে বিশ্রামের সময়, কিংবা পায়ে হেঁটে পথ চলতে চলতে।

প্রথম দিন আমি তাকে ভুল বুঝেছিলাম। ভেবেছিলাম যে এ গল্প সে হয়তো সবার কাছেই বলে। তা না হলে আমাকেই বা বলবে কেন! কিন্তু অল্প দিন পরেই ভুল আমার ভেঙে গেল। দেখলাম যে সে আর কারও কাছেই এ গল্প বলতে চায় না। অতর্কিতে কেউ এসে পড়লেই থেমে যায় গল্পের মাঝখানে।

শুধু একটি প্রশ্ন আমার মনে জেগে থাকে। এই গল্প শোনাবার জন্যে সে আমাকে কেন বেছে নিল! এই প্রশ্ন আমি তাকে শেষ দিনে করেছিলাম। তার উত্তর শুনে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। প্রথমটায় বিশ্বাস হয় নি। কিন্তু বিশ্বাস না করেও কোন উপায় ছিল না।

শেষ দিনের কথা শেষ দিনেই হবে, আজ হোক আজকের কথা। টাশি থেনডুপের গল্প আমি তার শৈশব থেকেই শুরু করি।

চার

গ্রামের ছেলে টাশি থেনডুপ জেদ ধরেছে, লামা হব।

পাঁচ বছরের জেদী ছেলে। মায়ের পরনের ছুব্বা টেনে ধরে ঝুলে বলছে, লামা হব, ঐ গোম্ফায় গিয়ে পুঁথি পড়ব।

কাঠ আর পাথরে তৈরি ছোট গোম্ফাটা নিচে থেকে কী সুন্দর দেখায়। ভোরবেলায় কুয়াশায় ঢেকে থাকে সব কিছু। আবহাওয়া একটু একটু পরিষ্কার হয়। যখন রোদ ওঠে, তখন রূপোর মতো ঝকঝক করে ওঠে পলদেন গোম্ফা। কোন দিন বিকেলে ঝড়ের মেঘ আসে ঘনিয়ে, অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয় চারি দিক। হলদে আলো বিদ্যুৎ তো নয়, যেন রূপোর তীর, অন্ধকারে লুকিয়ে থেকে কেউ সাঁই-সাঁই করে ছুঁড়ছে। বড় বড় মানুষের বুকও ভয়ে দুরদুর করছে। কিন্তু গোম্ফায় যারা থাকে তাদের একজনেরও বুকে এতটুকু ভয় নেই। কেন ভয় হবে! অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধ আছেন সগৌরবে দাঁড়িয়ে। বিরাট মূর্তি! তাঁর সামনে বিরাট পিলসুজ, আর চমরীর মাখনের প্রদীপ জ্বলছে উজ্জ্বল শিখায়। ধূপের উগ্র গন্ধে নিঃশ্বাসে টান ধরছে।

দেওয়ালের গায়ে মস্ত শানাই, কাড়া নাকাড়া। ঢালের মতো মস্তবড় করতাল। কিন্তু কেউ বাজাবে না। নিঃশব্দে সারি দিয়ে আসবেন লামরা। সারিবদ্ধ হয়ে বসবেন। বড় লামা মন্ত্র পড়বেন উদাত্তস্বরে। অন্য সবাই চোখ বুজে সেই মন্ত্রপাঠ শুনবেন। তারপর আসবে ছাতু আর চা। সবাই তো মদ খায় না, মাংসও খায় না। জীবন কাটায় শুধু ছাতু আর চা খেয়ে. চমরীর দুধের দই আর মাখন। কি শান্ত সমাহিত জীবন ঐ গোম্ফার ভিতর।

কিন্তু বাহিরে?

জীবনধারণের জন্য সে কী ভীষণ যুদ্ধ গ্রীষ্মে পাথর আর শীতে বরফ, তারই উপর ফসল জন্মাতে হবে। সারা বছরের ফসল।

যে শস্য ঘরে তোলবার মতো পুষ্ট হবার আগেই নামবে শিলাবৃষ্টি। সেদিন দূরের পাহাড়ে ঙাক-পার নৃত্য দেখা যাবে। পাহাড়ের উপর সে লাফাবে পাগলের মতো, চিৎকার করে ঢিল ছুঁড়বে আকাশের গায়ে। তারপর রাগে ক্ষোভে মাথার চুল ছিঁড়বে, নিজের জামা-কাপড় পর্যন্ত কুটি কুটি করে ছিঁড়ে বাতাসে উড়িয়ে দেবে।

কেন এমন করবে?

না করে যে তার উপায় নেই। ঐ ঙাক-পার উপরেই যে সমস্ত গ্রামের ফসল রক্ষার ভার। গ্রামের সমস্ত লোক যে তাকে ফসলের ভাগ দেয়, প্রতি বছর দেয়। হয় সে মাঠের ফসল রক্ষা করবে, নয় খেতে দেবে সারা বছর ধরে, তা না হলে সে কেমনতরো ঙাক-পা! শিলাবৃষ্টি যদি না হয়, যদি অল্পেই থেমে যায় ঝড়, তাহলে তার সুখ্যাতি ছড়াবে চারি দিকে। আরও দশটা গ্রাম তাকে মানবে। শিলাবৃষ্টি তো দেবতায় করে না, এ অপদেবতার কাজ। শক্তিমান ঙাক-পাই তাদের তাড়াতে পারে। তারা পাথরের নুড়ি কুড়িয়ে মাটির ঢেলা তৈরি করে রাখে। ঝড়বৃষ্টি শুরু হলেই যুদ্ধ শুরু করে সেই অপদেবতাদের সঙ্গে। উঁচু পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করে। সে কি যার-তার কাজ!

গ্রামের লোকেরা এ সমস্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখে। আর ভয়ে অস্থির হয়ে ওঠে। সারা বছর লড়াই। চারি দিকে অপদেবতা। শীত অজন্মা রোগ খুনোখুনি। প্রাণটা যে কোথায় কী ভাবে বেরবে, তা কারও জানা নেই।

শান্তি শুধু এক জায়গায়। ঐ পলদেন গোম্ফার ভিতর। নির্ভয় নিঃশঙ্ক চিত্তে লামারা সেখানে বাস করছেন। বুদ্ধের পায়ে আত্মসমর্পণ করে তাঁরা জীবন-যুদ্ধ এড়িয়ে চলবার ছাড়পত্র পেয়েছেন। কী নিশ্চিন্ত জীবন! পরম দুর্দশার দিনে গ্রামবাসীরা চেয়ে থাকে ঐ গোম্ফার দিকে। বিস্ময়ে শিশুরা অবাক হয়, নানা প্রশ্ন করে

বাপ-মাকে—ওখানে কারা থাকে? কেন সবাই থাকে না? কেন আমরা থাকি না?

একদা তিব্বতের সমস্ত পুরুষ লামা হতে চেয়েছিল। পাহাড়ের গুহায় ছোটবড় গোম্ফায় অগণিত অশিক্ষিত মানুষ ঢুকেছিল পেটের তাড়নায়। অসাধুতা ও অসংযমও তারা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর বেরিয়ে এসেছে অনেকে। কঠিন নিয়ম যাদের বরদাস্ত হয় নি, তারা বেরিয়ে এসেছে। নতুন করে সংসার পেতেছে। শুরু হয়েছে নতুন জীবন-যুদ্ধ।

শিশুরা এত সব বোঝে না। যেটুকু বোঝে, সেইটুকুই তাদের আকর্ষণ করে। গোম্ফার দেওয়ালের ধারে ঢোল সাজানো আছে সারি সারি। ঘণ্টা আছে। পাশ দিয়ে যাবার সময় ঘুরিয়ে দিতে হয়, নাড়িয়ে দিতে হয়। কেউ না কেউ সারাক্ষণ ঘোরাচ্ছে। সারাক্ষণ সেগুলো মুখর হয়ে আছে। কত রঙ, কত রঙ্গ, কত অদ্ভুত ব্যাপার। গুক্কু উৎসব একবার দেখলে সে আর ভোলা যায় না।

গ্রামের ছেলে টাশি থেনড়পও একদিন জেদ ধরল, আমি লামা হব।

পাঁচ বছরের জেদী ছেলে টাশি থেনড়প। মায়ের ছুব্বা ধরে টানতে লাগল, আমি লামা হব।

মা ভয় দেখিয়ে বললেন, কার কাছে থাকবি?

কেন, লামাদের কাছে।

কিন্তু আমি তো সেখানে থাকব না।

নাইবা থাকলে। আমি রোজ এসে তোমায় দেখে যাব

মা বললেন, ভারি বিপদ তো!

বাবা বললেন, চুপ করে থাকো, দুদিন পরেই ভুলে যাবে।

কিন্তু ছেলে ভুলল না। গোম্ফার ভিতর ঘুরে বেড়ায় আর ভাব করে লামাদের সঙ্গে। বড় লামার কোলে বসে পুঁথি পড়ে, আর দই মেখে ছাতু খায়। একদিন বড় লামা বললেন, ওরে, সারাদিন তো তুই মঠেই থাকিস, বড় হয়ে করবি কী?

খুশী হয়ে থেনডুপ বলল, লামা হব।

লামা হবি!

বড় লামা তাঁর ছোট ছোট চোখ আরও ছোট করে হাসলেন।

থেনডুপ বলল, কেন, আমি লামা হতে পারব না?

কিন্তু লামা হবি তুই কোন্ দুঃখে।

বুক ফুলিয়ে থেনডুপ বলল, আমি বড় লামা হব, আর তোমার মতো তক্তে বসে বই পড়ব। ছাতু খাব দই মেখে, আর কাঠের বাটি ভরে মাখন মেশানো স্যেজা।

স্যেজা মানে তিব্বতী চা। চীন থেকে চা আসে ইটের থানের মতো। জলে ফুটিয়ে সেই চা ঢালা হয় একটা চোঙের ভিতর। তার সঙ্গে চমরীর মাখন আর নুন। তারপর পিচকিরি চালানোর মতো কসরৎ করে সেই চা তৈরি হয়। তারই নাম স্যেজা।

চোখ বন্ধ করে বড় লামা বললেন, সাবাস।

থেনডুপ তাঁর গলা জড়িয়ে ধরল। বলল, মাকে তুমি বল না একবার। সন্ধ্যেবেলায় আমায় যেন ধরে নিয়ে না যায়।

বড় লামা হাসছিলেন মৃদু মৃদু।

থেনডুপ বিজ্ঞের মতো বলল, আর না হয় লুকিয়েই রাখ না। তোমার তো অনেক জায়গা আছে গোম্ফার ভেতর।

চোখ ছোট ছোট করে বড় লামা বললেন, তাহলে তো ছ্যাতেনেরও বড় কষ্ট হবে। সেও আর তোকে খুঁজে পাবে না।

পাশের বাড়ির প্রায় সমবয়সী মেয়ে ছ্যাতেন তার খেলার সঙ্গী। কিন্তু এই দুঃসংবাদে থেনডুপ একেবারেই বিচলিত হল না। বলল, তাকেও আমার সঙ্গে আনব।

আর একজন লামা ছিলেন বড় লামার কাছে। এতক্ষণ তিনি শুধু হাসছিলেন। এবারে বললেন, তাকে তো এখানে থাকতে দেওয়া হবে না।

কেন?

থেনডুপ জানতে চাইল উদ্বিগ্নভাবে।

লামা বললেন, ছ্যুতেন হল মেয়ে। মঠে তাদের জায়গা নেই।

গম্ভীর ভাবে থেনডুপ বলল, আমি জায়গা দেব।

বড় লামা হাসছিলেন। কোন কথা কইলেন না। উত্তর দিলেন অন্য লামা। বললেন, আমরা তো পারব না, তুমি দিলে তোমারও জায়গা হবে না।

থেনডুপ অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল, কিন্তু ছ্যুতেন তা কোন দোষ করে নি, তবে কেন তাকে থাকতে দেবে না?

থেনডুপকে লামা এ কথার উত্তর দিতে পারলেন না। বড় লামাকে বললেন, এ ছেলেটা ভারি তার্কিক হবে। এই বয়সেই এত কথা কইছে—

কিন্তু বড় লামার মুখের দিকে চেয়ে কথাটা তিনি শেষ করতে পারলেন না। বড় বিষণ্ণ, বড় চিন্তান্বিত দেখাচ্ছিল তাঁকে। থেনডুপ তাঁকে ব্যস্ত করে তুলল, বলল: কই, আমায় উত্তর দিলে না?

লামা তাকে ধমক দিলেন, কী ডেঁপো ছেলেরে বাবা!

কিন্তু বড় লামা তাকে বুকের কাছে টেনে নিলেন। মনে হল, এই ছোট ছেলেটার কাছে আজ তিনি হেরে যাচ্ছেন। যুদ্ধে জতবার মতো কোন ভাল অস্ত্র তাঁর হাতের কাছে নেই। চোখ বন্ধ করে থেনডুপের মাথার উপর সস্নেহে হাত রাখলেন।

এই স্নেহের স্পর্শ পেয়ে থেনডুপ খুশি হল, বলল, তাহলে ছ্যুতেনকেও তুমি থাকতে দেবে তো?

বড় বিব্রত বোধ করলেন বড় লামা, বললেন, আমরা আর কদিন আছি! তোরা থাকতে দিস।

এই উত্তর পেয়েই থেনডুপ খুশি হল, কিন্তু আশ্চর্য হলেন অন্য লামা। নিজের ক্ষুদে চোখজোড়া বিস্ফারিত করে বললেন, এ কী বলছেন আপনি!

গম্ভীর ভাবে বড় লামা বললেন, বুদ্ধের কী ইচ্ছা জানি নে।

নিশ্চয়ই এ তাঁর ইচ্ছা নয়।

তবে এরা নতুন কথা ভাবছে কেন!

উত্তর দেবার সময় বড় লামার বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

বাহিরে থেনডুপকে ডাকতে এসেছিল তার বাবা।

তার আনন্দ আর ধরে না। শুধু নিজের নয়, ছ্যুতেনেরও থাকবার ব্যবস্থা করেছে পলদেন গোম্ফায়। পথে বাবাকে বলল, আর বাড়িতে ফিরে মাকে বলল এই কথা। দৌড়ে গিয়ে ছ্যুতেনকেও বলে এল। তারপর বলল, কাল সকালেই আমরা গোম্ফায় যাব।

মা হেসে ফেললেন।

থেনডুপ বলল, হ্যাঁ, সত্যি বলছি, বড় লামা কথা দিয়েছেন আমাকে।

মা বললেন, বুঝেছি। ওঁরা তোমাকে ভোলাবার চেষ্টা করেছেন।

ভোলাবার চেষ্টা কী, থেনডুপ তা বোঝে না। শুধু এইটুকুই বুঝে এসেছে যে ছ্যুতেন আর সে দুজনেই মঠে থাকবে, আর লেখাপড়া করে লামা হবে। থেনডুপ জেদ ধরল, কালই আমরা মঠে যাব তো?

মা বিরক্ত হলেন, এ ভারি জ্বালা হল।

ও পাশের বাড়ি থেকে ছ্যুতেনের বাবাও এলেন এ বাড়িতে। বললেন, এ সব কী গোলমেলে কথা শুনছি বলতো!

থেনডুপের বাবা অভিজ্ঞ লোক, বললেন, তুমিও কি ছেলেমানুষ হলে নাকি!

ছ্যুতেনের বাবা বললেন, ছেলেমানুষ কেন হব! কিন্তু এরা যা বলছে সে কথাটা ভাল নয়। কাল সকালে একবার গোম্ফায় যেতে হবে।

তুমিও যেমন!

মন্তব্য করলেন থেনডুপের বাবা।

ছ্যুতেনের বাবা ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, কিন্তু লামা হয়ে তাঁদের এমন

কথা বলা উচিত! ছ্যুতেনের বয়েস তো বছর চার পাঁচ হল। সে যে ছেলে নয়, সে কথা বেশ বুঝতে শিখেছে। তার মাকে বলছিল, তুমিও চল।

থেনডুপ এসে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিল, বলল, আমিও আমার মাকে নিয়ে যাব।

অভিভাবকেরা হতবুদ্ধি হয়ে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলেন। গোম্ফার ভিতরে স্ত্রীলোক স্থান পাবে, অধ্যয়ন করবে, লামা হবে, এসব এমন অবিশ্বাস্য কথা যে কল্পনা করতেও ভয় হয়। পৃথিবীর কোথাও বুঝি কেউ কখনও এ কথা ভাবতে পারে না। পাঁচ বছরের ছেলে টাশি থেনডুপ আজ পলদেন গোম্ফায় বড় লামাকে ভাবিয়ে এসেছে। বিস্ময়াবিষ্ট করেছে নিজের বাপ-মা ও গ্রামবাসীকে। এমন অদ্ভুত কথা বুঝি থেনডুপের আগে কেউ কখনও ভাবে নি

পাহাড়ের পিছন থেকে অন্ধকার এগিয়ে এসেছিল। ঘরের ভিতরে কাউকে চেনা যাচ্ছিল না। থেনডুপ বলল, বাতিটা জ্বালব বাবা?

এ কথার উত্তর সেদিন থেনডুপকে কেউ দেন নি।

লেখাপড়া শিখে টাশি থেনডুপ লামা হবেই। ছ্যুতেনকেও লামা করবে। সে ভাবে, ছেলেমানুষ পেয়ে সবাই তাকে বোকা বোঝাচ্ছে। এক সঙ্গে থাকতে পারে, এক সঙ্গে খেলতে পারে, তাতে দোষ নেই। আর এক সঙ্গে পড়াশুনো করে লামা হলেই দোষ। মা লামা হয় নি, ছ্যুতেনের মাও লামা হয় নি, নাই বা হল। ছ্যুতেনের যখন ইচ্ছা আছে, আর তারও ইচ্ছা, তখন দোষটা কোথায়? এ সমস্তই বড়দের ফন্দি। তার সঙ্গে ভাব রাখতে দেবে না। এই হল আসল কথা। থেনডুপ ভাবে, বড় লামা মানুষটা এদের চেয়ে ঢের ভাল। তিনি কিছুতেই না বলেন না। কিন্তু দুষ্টুও বেশ আছেন হাঁও বলেন না কোন কথায়।

থেনডুপের বাবার ইচ্ছা ছিল না ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবার। তার কী দরকার আছে! ঘর সংসারই যদি করতে হয় তো মঠের ভিতরে কয়েকটা বছর নষ্ট করে লাভ কী! তার চেয়ে সংসারের কাজই ভাল করে শিখুক। ইয়াকগুলো ইচ্ছা মতো চরে বেড়ায়। ফেরেও না সময় মতো। সেগুলোকেও একটু পাহারা দেওয়া দরকার। তার উপর একপাল ছাগল আছে। ইয়াক না পারুক, ছাগল চরাবার বয়স তো তার হয়েছে। মায়ের ফাইফরমায়েসও কি কম! একটা মেয়ে থাকলে তাঁর ভাবনা ছিল না।

কিন্তু থেনডুপ নাছোড়বান্দা। বড় লামার কোল থেকে নামতে চায় না। শেষ পর্যন্ত নামতেও হল না। বড় লামার আগ্রহেই থেনডুপের বাবা মত দিলেন। ঠিক হল, থেনডুপ লেখাপড়া শিখবে। তারপর সংসারে ফিরবে। তিব্বতে এই নিয়মই ছিল। সেখানে স্কুল বলতে মঠ, আর মাস্টার বলতে লামা। লেখাপড়া শিখতে চাইলে মঠে যেতে হবে। লামাদের হাতে প্রচুর মার খেতে হবে। মার না খেলে নাকি মানুষ হয় না তিব্বতের ছেলে। তার পরেও যদি কেউ মঠে থাকতে চায় তো সে লামা হয়ে থাকবে। বাকি ছেলেরা সংসার করতে ফিরে যাবে।

ছ্যাতেন এ অধিকারে বঞ্চিত। দিন কয়েক কেঁদেছিল, তারপর সব ঠিক হয়ে গেল। মাঝে মাঝে থেনডুপকে দেখতে মঠে আসত। থেনডুপ তাকে সান্ত্বনা দিত, ঘাবড়াস নে, আমি তোকে নিয়ে আসব। আমি লামা হলে এদের আইন কানুন সব ভেঙে দেব।

মঠে এসে থেনডুপ কথা বলতে শিখছে শুনে শুনে। লামারা তাকে আইন কানুন শেখাচ্ছেন। না শুনলে বকুনি, না মানলে মার, না শিখলে নাকি বিপদ আরও বেশি। থেনডুপ তাই সবাইকে সাহস দেয়। আমি লামা হলে এদের নিয়ম সব ভেঙে দেব। একদিন এক লামা শুনতে পেয়েছিলেন এই কথা। কানটা তার ছিঁড়ে নিতে

চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, যত্ত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। বল্, আর কখনও বলবি না।

থেনড়ুপ কোন উত্তর দেয় নি। নিঃশব্দে মার খেয়েছে পড়ে পড়ে। তবু বলে নি, আর বলব না। বড় লামা এসে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেছেন। জিজ্ঞেস করেছেন, লেগেছে খুব?

গোমরা মুখে থেনড়ুপ বলেছে, না।

তার শুকনো চোখ কিন্তু ছলছল করে উঠেছে। আঘাতের বেদনার চেয়ে সমবেদনায় দুঃখ বুঝি বেশি। বড় লামা যে তাকে স্নেহ করেন, থেনড়ুপ সে কথা অনুভব করে।

মঠে থেনড়ুপের অনেক কাজ। সে তো একা নয়। আরও অনেক বালক আছে তারই মতো। আশেপাশের গ্রাম থেকে তারা এসেছে, কিন্তু তার মতো শিশু কেউ নয়। থেনড়ুপ তার কথার মতো কাজেও তাড়াতাড়ি বাড়ছে। বড় লামার পোশাকের উপর তার বড় লোভ। অমন সুন্দর হলদে রঙের শাটিনের জামা, তার উপর কত কারুকার্য আর মাথায় তাঁর মুকুটের মতো টুপি। সাধারণ লামাদের মতো একটা পোশাক পেলেও তার এখন চলে যায়। গাঢ় লাল রঙের জামার উপর হলদে টুপিটা মন্দ দেখায় না। খাতিরও বেশ আছে। গ্রামের লোকেরা তো খাতির করেই, মঠেও তাদের প্রতিপত্তি।

যে ছেলের দল পড়তে এসেছে, লামাদের পরিচর্যা করে আর বেপরোয়া মার খেয়েই বুঝি তারা মানুষ হবে। এক এক সময় থেনড়ুপের মনে হয় যে তারা না থাকলে মঠ চলত না, কোন উৎসব হত না মঠে। লামারা শুধু নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত, মঠ চালাচ্ছে ছোট ছোট ছেলেরা। মঠে উৎসব হবে? কোথায় ছেলের দল? ভারে ভারে চমরীর মাখন আনছে গ্রামবাসীরা, সে সব তুলে রাখ। যেখানে সেখানে রাখলে চলবে না। প্রার্থনার ঘরে ধাপের উপর

পিতলের দীপাধারে প্রদীপ জ্বলছে। বিরাট পাত্র আছে তারই পাশে। সেই পাত্রে মাখন থাকবে। তেমনি করে দই-এর জায়গায় দই, ছাতুর জায়গায় ছাতু, শুকনো মাংসও আসবে কিছু। বড় লামা মাংস খান না। যাঁরা খান, তাঁরা নিজের ঘরে লুকিয়ে খান। বলতে বারণ করেন বড় লামাকে।

চমরীর মাখন জ্বলে মোমের মতো। বড় স্নিগ্ধ আলো। তার সঙ্গে গোলাপী ধূপের গন্ধ। সে তেমন মিষ্টি নয়, বড় উগ্র। বেশিক্ষণ কাছে থাকলে নিঃশ্বাসে টান ধরে।

তেমনি বাজনা। এত বড় বড় বাদ্যযন্ত্র কারও বাড়িতে থাকে না। পিতলের সানাইটা কম করেও হাত চারেক লম্বা হবে, বড় মানুষের হাতের মাপে। আর গাড়ির চাকার মতো বড় বড় করতাল তারই সঙ্গে মানানসই কাড়া নাকাড়া। বেদীর বাম দিকে ধর্মচক্র। সেই দিকেই সাধারণ প্রবেশ-দ্বার। সেই পথ দিয়ে যন্ত্র-শিল্পীরা এসে যখন বাজাতে শুরু করবে, তখন সে বাজনাকে আর মিষ্টি লাগবে না। ঐ বাজনার চেয়ে বড় লামার কণ্ঠে স্তোত্রপাঠ শুনতে অনেক ভাল লাগে।

উৎসবের দিন লামারা সব সাজতে বসবেন। নিজেদের জামা কাপড়ের উপর পরবেন লামার পোশাক। প্রার্থনা সভায় আসবেন নানা দিক থেকে নানা কায়দায়। সে সব কায়দায় ভুল হলে চলবে না। সামরিক বাহিনীর কুচকাওয়াজ হচ্ছে, এই রকম মনে হওয়া চাই। তারপর সারিবদ্ধ হয়ে সবাই অপেক্ষা করবেন বড় লামার জন্যে।

বড় লামা আসবার আগেই সবাই জানতে পারবেন যে তিনি আসছেন। যাঁকে সেনাপতির মতো দেখতে, তিনি আস্ফালন শুরু করে দেবেন। উৎসবের পোশাকে কী সুন্দর দেখায় বড় লামাকে মানুষটা ভাল বলেই বোধহয় অমন সুন্দর দেখায়। ভাল পোশাক তো আরও অনেকে পরেন, কিন্তু তাঁদের তো ভাল দেখায় না। বর

এক এক জনকে বড়ই বেয়াড়া দেখায় কেন তাঁরা লামা হয়েছেন, সেই কথা থেনডুপ ভেবে পায় না।

বড় লামা সভায় আসতেই অন্য লামারা তাঁকে নমস্কার করবেন, স্তুতি করবেন। শুধু মাথা নত করে বড় লামা তাঁদের উত্তর করবেন। বেদীর কাছে এসে একজন তাঁর পায়ের লামখো খুলে দেবেন। বড় লামা বেদীতে বসবেন। টুপি খুলে খুলে অন্য লামারাও বসবেন তাঁদের আসনে। তারপর সেই সেনাপতি সাজের লামা আবার খানিকটা আস্ফালন করবেন।

যাঁর মন্ত্রপাঠ শুনতে ভাল লাগে, তিনি বেশিক্ষণ পাঠ করেন না। একটুখানি পড়েই থেমে যান। তারপর সমস্ত লামারা একসঙ্গে আবৃত্তি শুরু করেন। কেন তাঁরা গলার স্বর বিকৃত করে নাকী সুরে পাঠ করেন, থেনডুপ তা বোঝে না। বড় লামাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি শুধু হাসেন। ভারি উৎসাহ লামাদের। একটানা একঘেয়ে সুরে চেঁচিয়েই যান। কিছুতেই যেন থামতে চান না। থেনডুপ বড় লামা হলে তাঁদের চেঁচাতে দিত না। এক দিন একটা ছেলে দোতলার কাঠের বারান্দা ভেঙে নিচে পড়ে গিয়েছিল। দাঁত-কপাটি লেগে অনেকক্ষণ ধরে সে গোঁ গোঁ করেছে। লামাদের মন্ত্রপাঠ শুনলে থেনডুপের সেই গোঙানির কথা মনে পড়ে।

বড় লামা এ সমস্ত নিশ্চয়ই বোঝেন। তা না হলে নিজে কেন এঁদের সঙ্গে গোঙান না, ওঁরা থামলে কিছুক্ষণ তিনি চোখ বুজে ধ্যান করেন। তারপর একটুখানি পাঠ।

বাস্, এই পর্যন্ত লামাদের কাজ। তারপর দরকার থেনডুপদের। চার পাঁচ সারিতে লামারা বসে আছেন। কাঠের তক্তার উপর লাল আসন। সাত আটটি করে আসন। প্রত্যেকের সামনে হাতখানেক উঁচু এক-একটি কাঠের চৌকি। থেনডুপরা জলের পাত্র আর চায়ের বাটি অনেক আগেই রেখে গেছে। এবারে তারা ধরাধরি করে বড় বড় চামড়ার পাত্র এনে বেদীর বাঁ দিকে জমা

করবে। কাঠের বালতিতে ঘন দই, বারকোশে ছাতুর স্তূপ। লামার
এই সবেরই অপেক্ষা করছেন। কেউ সামনের পাত্রগুলো ঠিব
করবেন। কেউ বা জামার ভিতর থেকে লাল রঙের রুমালে জড়ানে
নিজের পাত্র বার করবেন। রূপো বাঁধানো কাঠের পাত্র।

থেনডুপরা সকলের আগে চা দেবে। তারপর ছাতু। দই
পরিবেশনের পর আর একবার ছাতু দেবে। বড় লামা এখানে
খান না। চায়ের বাটিটা একবার ঠোঁটে ঠেকিয়ে নামিয়ে রাখেন
অনেক দিন থেনডুপ দেখেছে যে পিছনের সারিতে যে লামারা বসে
তাঁরা তাঁদের জামার ভিতর থেকে শুকনো মাংস বার করে রসিয়ে
রসিয়ে দই ছাতু খান।

আহারের পর সবাই রুমালে মুখ মোছেন। কিন্তু পাশে দাঁড়িয়ে
থেনডুপ লক্ষ্য করেছে যে কয়েক জনের ভিতর-পকেটে একখানা করে
বই-এর মতো পাট-করা রুমাল আছে। তার বাইরেটা লাল, কিন্তু
খুললেই দেখা যায় যে ভিতরটা চটের। লামারা খক করে থুতু
ফেলে মুড়ে সেটা পকেটে রাখেন। আশ্চর্য হয়ে থেনডুপ ভাবে
এ কি বুকের ভিতর রাখবার জিনিস!

একদিন বড় লামাকে থেনডুপ এই কথা জিজ্ঞাসা করেছিল
তিনি হেসে বলেছিলেন, বেশ তো, বুদ্ধকে তুমি বুকের ভিতর রেখো।

বুদ্ধকে কি বুকের ভিতর রাখা যায়!

থেনডুপের চোখের তারায় কৌতূহল উছলে উঠল।

তার মাথায় হাত বুলিয়ে বড় লামা বললেন, কেন যাবে না
বুদ্ধ তো বুকেরই জিনিস। সকলের বুকে আছেন।

কই, আমি তো দেখতে পাই নে।

পাবে, দেখতে চাইলেই পাবে।

আমি তো রোজ দেখতে চাই।

বড় লামা তার মাথায় হাত বুলতে বুলতে বললেন, আরও ভাল
করে চাইতে হবে।

থেনডুপ তখন আর পাঁচ বছরের শিশু নয়। কিশোর থেনডুপ মনোযোগ দিয়ে শুনল বড় লামার উত্তর। ভাবল, এই ভাল করে ঢাইবার ব্যাপারটা আর একদিন সে ভাল করে জেনে নেবে। বড় লামা বোধহয় আজ সে কথা বলবেন না।

থেনডুপ লক্ষ্য করেছে যে যারা মঠে আসে, তারা একটা অন্ধকার ঘর ঘুরে যাবেই। সেই ঘরে একটা মানুষপ্রমাণ কাঠের ঢাক উপুড় করা আছে, লোহার একটা দণ্ডের উপর দাঁড় করানো। মানুষের চেয়েও উঁচু। আর বাহিরটা নানা চিত্রে শোভিত। কয়েকগাছা দড়ি আছে। সেই দড়ি ধরে সবাই ঢাকটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। তাতে ঘণ্টার ধ্বনি হয়। মঠে এলে এই ঘরে ঢুকতে কেউ ভোলে না। থেনডুপের কিন্তু আশ্চর্য লাগে এই সব দেখে।

একদিন বড লামাকে সে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেছিল। উত্তরে বড় লামা শুধু হেসেছিলেন। মসৃণ করে মুড়োনো মাথা, মুখে কয়েকগাছা গোঁফ আর দাড়ি সোনালি থেকে সাদা হয়ে এসেছে। ধীর-স্থির সৌম মুখ। কথা না বলে হাসি দিয়েই সব কাজ সেরে দেন। ভাল করে হাসলে তাঁর ছোট ছোট চোখ একেবারে বুঁজে যায়। থেনডুপ এখন বড় হয়েছে। বলে, এমন করে এড়িয়ে গেলে চলবে না।

বড় লামা হেসে বলেন, সময় হলেই সব বুঝতে পারবে।

কখন সময় হবে?

আরও বড় হও।

এই কথায় থেনডুপের আত্মাভিমানে আজকাল আঘাত লাগে। কয়েকটা বছর মঠের ভিতর কাটিয়েও কি সে বড় হল না? বড় লামার কথার উত্তর দিতে তার ইচ্ছা হয় না। কিন্তু জানবার ইচ্ছা আরও বেশি। বলে, আমি তো প্রায় তোমার সমান হয়েছি।

উত্তরে বড় লামা হাসেন।

হই নি?

হয়েছ বৈকি, লম্বায় হয়েছ।

তবে বল।

বড় লামা তার গালে হাত দেন, বলেন, আমার মতো গোঁফ-দাড়ি গজাক, পাকুক সেগুলো, তখন সবই বুঝতে পারবে।

থেনডুপ কিন্তু নাছোড়বান্দা। জোর করেই সে জেনে নিয়েছিল যে ঐ সমস্ত ঢাক-ঢোল অজ্ঞান মানুষের জন্য। যারা দুদণ্ড স্থির হয়ে বুদ্ধের কথা ভাবতে পারে না, তারা ঐ ঢাক বাজিয়ে যায়। একদা বুদ্ধদেব নূতন ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছিলেন। যে তা গ্রহণ করে তাঁর স্মরণ নেবে, সে নির্বাণ লাভ করবে। স্থূলবুদ্ধি মানুষের জন্য ঐ ঢাক-ঢোলের সঙ্কেত।

থেনডুপ তখনই জানতে চেয়েছিল, তাহলে জপের মণিচক্রও কি তাই ?

প্রশ্ন শুনে বড় লামা কিছু বিস্মিত হন। কোন কিশোরের মুখে এ সব প্রশ্ন যেন শোভা পায় না। এ সমস্ত আলোচনা খুব ভাল নয়, নিরাপদও নয়। বড় লামা কোন উত্তর দেন না।

থেনডুপ বলে : ঐ মণিচক্রের মধ্যে বুদ্ধের নাম লক্ষবার লেখা আছে। একবার মণিচক্র ঘোরালে লক্ষবার জপের ফল। আচ্ছা তুমিই বল, এর চেয়ে একবার বুদ্ধকে স্মরণ করা কি ভাল নয় ?

কী বিপদ এই সব ছেলে নিয়ে! মনে মনে লামা বুঝি প্রমাদ গণেন। উত্তর না দিয়ে চোখ বন্ধ করেন।

থেনডুপ অপেক্ষা করতে শিখেছে। বড় লামা কদিন আর তাকে ফাঁকি দেবেন! শক্ত করে চেপে ধরলে বুড়োর কাছে জবাব একদিন পাওয়া যাবেই।

মঠের ভিতরে আর একটা অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘর আছে। এক জায়গায় একটা বেদী। তার উপর পিতলের বুদ্ধমূর্তি আর ঝকঝক করে না। ছোট বড় আরও অনেক মূর্তি আছে। সেগুলো ধুলোয় ও অযত্নে মলিন। তার চেয়েও বেশি ধুলো জমেছে তাকের উপর,

র‍্যাকের পুঁথিগুলোর উপর। দেওয়ালের গায়ে সারি সারি কাঠের তক্তা। তার উপরে নানা আকারের পুরনো পুঁথি সাজানো আছে স্তরে স্তরে। লাল সুতোয় বাঁধা, কাঠের মলাটের উপর নানা রঙের চিত্র আঁকা। বিরাট আকারের বইও আছে অনেক, সে সমস্ত লাল কাপড়ে বাঁধা। থেনডুপ প্রথম যেদিন সেই ঘরে ঢুকেছিল, সেদিন তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। এমন গুমোট যে ঢুকতে ভয় করে। হাতে বাতি নিয়ে সে এই ঘরে ঢুকেছিল। সেদিন ঐ বড় বড় লাল পুঁথিগুলোকে সে কালো রঙের দেখেছিল।

ও সব কী পুঁথি?

জিজ্ঞাসা করেছিল বড় লামাকে।

সংক্ষেপে বড় লামা বলেছিলেন, আমাদের শাস্ত্র।

শাস্ত্র কী?

ঐ ঘরে যা আছে, তার নাম শাস্ত্র।

তুমি পড়েছ তো সব?

বড় লামা গম্ভীর ভাবে শুধু মাথা নাড়লেন।

থেনডুপ বলল, আমিও পড়ব।

তাকে সম্মতি দেবার সময় বড় লামা বুঝতে পারেন নি যে কী বিপদ তিনি ঘাড়ে নিলেন। থেনডুপ দিন কয়েকের ভিতরেই ঘরটাকে ঝকঝকে তকতকে করে ফেলল। আর এক একখানা পুঁথি এনে বসতে লাগল বড় লামার সামনে। তাঁর কোলে বসে পড়বার বয়স তার উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এখন তাঁর সামনে বসে পড়ে। বড় লামা একটা কাঠের স্ট্যাণ্ডের উপর পুঁথি রেখে পড়েন। থেনডুপও একটা যোগাড় করে নিল।

রোজ সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ে। আর বুঝতে না পারলেই তাকে জিজ্ঞাসা করে বড় লামাকে। উত্তর না দিয়ে উপায় নেই। ক্লান্ত হবার ভান করেও তিনি নিষ্কৃতি পান না। অন্য লামা তাঁর ক্লান্তি দেখলে বলেন, কেন এত প্রশ্রয় দিচ্ছেন ওকে?

উত্তরে বড় লামা শুধু হাসেন।

কিন্তু অন্য কোন লামা হাসেন না। তাঁরা গম্ভীর ভাবে সরে যান। আড়ালে পেলে থেনডুপকে বকতে বাকি রাখেন না। নানা রকম নির্যাতনও করেন। সমবয়সী বন্ধুরাও তাঁকে কথা শোনায়।

বড় লামাকে এ সব কথা থেনডুপ কোন দিন বলে না। তিনি হয়তো দুঃখ পাবেন। দুঃখের ভাগ কাউকে দিতে নেই। বড় লামা তো এই কথাই তাকে বলেছেন। বলেছেন, তাঁর কথা মেনে চললে বুদ্ধের সমস্ত উপদেশ তাকে শিখিয়ে দেবেন। সুকর্মের দশটি নির্দেশই তো বুদ্ধের শেষ কথা নয়, সে বোধহয় প্রথম কথা। বুদ্ধের সব কথা জানবার ইচ্ছা প্রতিদিন থেনডুপের বেড়ে যাচ্ছে। বড় লামাকে অসন্তুষ্ট করলে এখন চলবে না। তার জন্যে নীরবে নির্যাতন সওয়া ভাল।

থেনডুপ বড় হচ্ছে।

পাঁচ

হোটেলে ফিরেই আমাকে আমাদের দলপতি মিস্টার ধীরের সম্মুখীন হতে হল। দূর থেকেই আমি দেখতে পেয়েছিলাম যে মায়া ধীর দৃষ্টি রেখেছে পথের দিকে। আমাকে দেখতে পেয়েই ভিতরে সংবাদ দিয়েছে। মিস্টার ধীরের পিছনে গোটা দলটা আমাকে আক্রমণ করতে এগিয়ে এলেন। গম্ভীর গলায় মিস্টার ধীর বললেন : কোথায় যাওয়া হয়েছিল ?

আমিও গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলাম : নন্দাদেবীর মন্দিরে।

পিছন থেকে মায়া ধীর বলে উঠল : মিথ্যে কথা ভাইসাহেব। আমি ওঁকে লামার সঙ্গে যেতে দেখেছি।

ডিফামেশন। আমি মানহানির মামলা করব। মিথ্যা কথা আমি বলি না।

মায়া বলল : আমি প্রমাণ করে দেব ভাইসাব, উনি লামার সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলেন। যান নি ?

বলে আমার দিকে তাকাল।

আমি বললাম : লামার সঙ্গেই নন্দাদেবীর মন্দিরে গিয়েছিলাম।

প্রবল কণ্ঠে মিস্টার ধীর হেসে উঠলেন। কিন্তু মায়া চটে উঠল, বলল : দলে এই রকমের ইন্‌ডিসিপ্লিন তুমি মেনে নিচ্ছ ! তোমার শাসন কড়া না হলে এতগুলো মানুষকে তুমি সামলাবে কী করে।

হাসতে হাসতেই মিস্টার ধীর বললেন : সে ভার তোমার উপরেই দেব।

মিসেস ধীর আমাদের চায়ের টেবিলে টেনে আনলেন।

চা খেতে খেতে মিসেস মাথুর বললেন : আপনার লামাও কি আমাদের সঙ্গে যাবেন নাকি ?

বললাম: আমাদের সঙ্গে নয়, তবে দলের সঙ্গে থাকবেন শুনেছিলাম।

এখন কি অন্য কিছু শুনলেন?

অভয় দিলে বলতে পারি।

বলে আমি মায়ার দিকে তাকালাম।

উত্তর দিলেন মিসেস মাথুর, বললেন: আমি আপনাকে অভয় দিচ্ছি।

বললাম: মিস ধীরকে দেখে লামা ভয় পেয়ে গেছেন।

কেন?

ছ্যুতেন নামে তার গ্রামের একটি মেয়ের কথা মনে পড়ে গেছে, ভারি মিল নাকি দুজনের চেহারায়।

নিমেষে মায়ার হাত উঠল তার নাকের উপর, আর মিস্টার ধীর আবার উদ্দাম ভাবে হেসে উঠলেন।

মিসেস মাথুর বললেন: না না, অমন টিকলো নাক মায়ার, ওকে তিব্বতীর মত বলবেন না।

বললাম: আমি তো বলি নি, বলেছে সেই লামা। নিশ্চয়ই কোন মিল দেখেছে, না দেখলে বলবে কেন।

মায়া বলল: থাকলেই বা মিল, তাতে ভয় পাবার কী আছে?

ওই মেয়েটার ভয়েই দেশ থেকে পালিয়ে এসেছে কি না, সেই কথা জেনে নিতে হবে।

মিসেস মাথুর বললেন: লামারা সন্ন্যাসী বলে শুনেছি, ওদের সঙ্গে আবার মেয়েদের সম্বন্ধ কী!

আমি গম্ভীর ভাবে বললাম: মেয়েদের ব্যাপার আপনারাই ভাল বুঝবেন। এ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা নিতান্তই কম।

মিস্টার ধীর যে হাসতে ভালবাসেন, আবার তার প্রমাণ দিলেন।

চা খেয়ে আমরা শহর দেখতে বেরলাম। এ শহরে রাজপথ

বলতে একটিই, তারই উপরে মোটর চলাচল করে। এই পথেই আসে রাণীক্ষেতে বাস, কাঠগোদামের বাসও আসে। আবার এইখান থেকেই চলে যায় কৌশানি আর পিথোরাগড়। আরও অনেক জায়গার বাস ছাড়ে। সে সব জায়গার নাম আমাদের জানা নেই।

এই রাজপথের আর এক ধাপ উপরে একটা সমান্তরাল পথ আছে। তারই উপরে বাজার-হাট, কোর্ট-কাছারী। এই পথ সমতল নয় বলেই কোন যানবাহন চলাচল করে না। শহরের মধ্যে দর্শনীয় স্থান কিছু নেই। যা আছে তা সব দূরে দূরে। সেও সব পাহাড়। যাঁরা মানস সরোবর ও কৈলাস যাবেন বলে আলমোড়ায় এসেছেন তাঁদের সে সব পাহাড় দেখবার কোন মানে হয় না।

কথায় কথায় আমরা সদর রাজপথের উপরেই নেমে এসেছিলাম। বাস স্ট্যাণ্ডে অনেকগুলো বাস দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই একটা বড় বাড়ির একতলায় বুকিং ও রিজার্ভেসন অফিস।

মিস্টার ধীর বললেন: রিজার্ভেসন আজ করে রাখলেই বোধহয় ভাল হত।

মিসেস মাথুর বললেন: কাল হয়তো দেরি হয়ে যাবে।

মিস্টার মাথুর বললেন: দেরি হলে জলে পড়বার ভাবনা নেই।

মিসেস ধীর বললেন: বরং দেরি না হলেই জলে পড়া হবে।

মিস্টার মাথুর এই মন্তব্য শুনে ভারী খুশি হলেন. বললেন: সে কথাটা এঁরা বুঝলে ভাল হত।

মায়া বলল: দু দলের কথাই আমি বুঝতে পারছি। আর মিস্টার রায়ের কথাও। ওকে একখানা মোটা খাতা আর পেনসিল কিনে দেব।

কেন?

ফাউণ্টেন পেনের কালি তো নেওয়া হচ্ছে না, কলমের কালি ফুরিয়ে গেলে ওঁকে মুস্কিলে পড়তে হবে।

বললাম: পাতা ফুরোয় না এমন খাতা আমার কাছে আছে আর সে খাতায় লিখতে পেনসিলেরও দরকার হয় না।

মিসেস ধীর জিজ্ঞাসা করলেন: সে আবার কী রকম খাতা ?

আমি হেসে বললাম: মন। মনের খাতায় পেনসিল দিয়ে লিখতে হয় না।

মিস্টার মাথুর বললেন: বেশ বলেছেন, জীবনের কোন কথাই তো আমরা লিখে রাখি না. কিন্তু সব কথাই মনে থাকে। সময় মতো ঠিক মনে পড়ে যায়।

বললাম: সত্য কথার গুণই তাই, সে কখনও ভুল হবার নয়। মানুষ ভুলে যায় মিথ্যে কথা, অনেক চেষ্টা করেও মনে রাখতে পারে না।

আমার মনে পড়েছিল থেনতুপ লামার কথা। কত বছর আগে সে তার গোম্ফা ছেড়ে চলে এসেছে, কিন্তু আজও কিছু ভুলতে পারে নি। পাঁচ বছর বয়সের কথাও ভোলে নি একটিও। তার গোম্ফার বর্ণনা শুনে আমার মনে হয়েছে যে, তার ছবি সে তার চোখের সামনে আজও স্পষ্ট দেখতে পায়। সত্য এই রকমই। সত্যের মৃত্যু নেই। নেই বিস্মৃতি।

বাস স্ট্যাণ্ড ছেড়ে আমরা এগিয়ে গিয়েছিলাম। রিজার্ভেসন করা আর আমাদের হয় নি। মিস্টার ধীর বললেন: ঠিক আছে, কাল সকালে এসেই ব্যবস্থা করে যাব।

মিসেস মাথুর বললেন: প্রয়োজন হলে রাতে এসেই বাসে উঠব।

পুরাকালের ব্যবস্থা ছিল অন্য রকম। পিথোরাগড়ের উপর দিয়ে আস্কোট পর্যন্ত মোটরের রাস্তা তখনও তৈরি হয় নি। কৈলাসের পদযাত্রা আলমোড়া থেকেই আরম্ভ হত। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে আষাঢ়ের প্রথমে কৈলাস যাত্রার প্রশস্ত সময়। তার আগে

থেকেই যাত্রীরা এসে আলমোড়ায় জমা হত। হোটেল ও যাত্রী-নিবাসগুলো যেত ভরে। অশক্ত ও মহিলাদের জন্য ডাণ্ডি ভাড়া পাওয়া যায়। কিনতেও পাওয়া যেত প্রায় একই খরচে। সরকারের তহশীলদারী অফিসে টাকা জমা দিলে তখন ঘোড়ার ও কুলির ব্যবস্থা হত। সীলমোহর দেওয়া পরওয়ানা পাওয়া যেত। যাঁরা সস্তায় ঘোড়া চাইতেন, তাঁরা স্থানীয় লোকের সাহায্যে সস্তায় ব্যবস্থা করতেন। এ ব্যবস্থা কৈলাস পর্যন্ত নয়। আলমোড়ার কুলি ও ঘোড়া ধারচুলার তপোবন পর্যন্ত যেত। গার্বিয়াং নামে একটা জায়গা পর্যন্ত যায় ধারচুলার কুলি আর ঘোড়া। গার্বিয়াং থেকে তিব্বতের তাকলাকোট আর সেখান থেকে কৈলাস যাতায়াতের ব্যবস্থা।

একটি মালবাহী ঘোড়া মণ দুই ওজন বইতে পারে। এই মালের জন্য কুলি নিলে তিনজনের দরকার। গার্বিয়াং থেকে ঝব্বু পাওয়া যায়, তিব্বতীরা বলে ইয়াক। গার্বিয়াং থেকে গাইডের দরকার। তারও মজুরী ও খোরাকী বহন করতে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে যাঁরা কৈলাস দর্শনে গেছেন তাঁদের মাথাপিছু খরচ পড়ত একশো থেকে তিনশো টাকা। দুজনে একটা ঘোড়া নিয়ে যাত্রীদের সঙ্গে বিনা গাইডে গেলে একশো টাকার মধ্যেই খরচ কুলতো। ঘোড়ায় চেপে আরাম করে গেলে খরচ পড়ত দুশো, আর তিনশো টাকা বেশি লাগত ডাণ্ডিতে চেপে গেলে। এখন কত খরচ পড়বে, সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই। সর্বত্র সব জিনিসের দর বেড়েছে। ঘোড়ার ভাড়া বেশি, কুলি খরচ বেশি, খাদ্যদ্রব্যের অগ্নিমূল্য। তার উপর অনেক বেশি বিলাস-ব্যসনে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আজকাল কোন সাধারণ দেশী হোটেলে একমাস থাকতে হলে আড়াই শো থেকে তিন শো টাকা খরচ। অথচ সে-যুগের কৈলাস-যাত্রীরা মাসিক কুড়ি টাকা খাই-খরচই যথেষ্ট

মনে করতেন। এই টাকাতেই তাঁরা মিছরি আর মেওয়া খেতেন পথে। দেশে তখন দারিদ্র্য এমন উগ্র ছিল না।

একটা বড় দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মিস্টার ধীর বললেন: আমাদের দলের নতুন বন্ধুর জন্য কিছু কিনতে হবে না?

মায়া বলল: একটা গগল্‌স্‌ নিশ্চয়ই চাই।

আমি বললাম: খুঁজলে হয়তো বাক্সে একটা পাওয়া যাবে।

মায়া বলল: নিজের জিনিসপত্র কি আপনি সামলে আনেন নি?

হেসে বললাম: সে অভ্যাস নেই।

কে সামলায় তবে?

দেশে আমাকেও সামলাবার মানুষ আছে।

আমার কথা শুনে মহিলারাই বেশি আশ্চর্য হলেন। মিসেস মাথুর বললেন: তবে আপনি একা বেরিয়েছেন কেন?

বললাম: কী করব বলুন, তিনি ছুটি নিয়েছেন দু মাসের। দু মাসের আগে আমার দেশে ফেরা চলবে না।

মিস্টার ধীর বললেন: এর মধ্যে একটু হেঁয়ালি আছে বলে মনে হচ্ছে।

আমি বললাম: হেঁয়ালি কিছুই নেই। সারা বছর তিনি আমাকে সামলান, কিন্তু বছরে একবার ছুটি দিতেই হয়। সাধারণত এক মাস, দেশে বিয়ে-সাদী থাকলে দু মাস। এবারেও গোরখপুর পর্যন্ত তিনি আমাকে সামলে এনেছেন।

মায়া আমার দিকে তাকিয়েছিল কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে। আর মিসেস ধীর বললেন: আশ্চর্য। তাঁকে আপনি গোরখপুরে ফেলে এলেন!

তাঁর বাড়ি যে সেখানে। বছরে একবার তাঁকে ছুটি না দিলে সারা বছর তিনি আমাকে সামলাবেন কেন।

মিস্টার ধীর এবারে দলপতির মতো গাম্ভীর্য নিয়ে বললেন: আপনি কার কথা বলছেন বলুন তো?

আমি অত্যন্ত সবিনয়ে বললাম: কেন, আমি আমার ভৃত্য বাবুলালের কথা বলছি।

সকলেই এক সঙ্গে হেসে উঠলেন।

মিসেস ধীর বললেন: আমরা ভেবেছিলাম, আপনি নিজের স্ত্রীর কথা বলছেন।

আমি লজ্জিত ভাবে বললাম: ছি ছি, আপনারা সে কথা কেন ভাবলেন।

মিস্টার ধীর আর একবার হেসে বললেন: রিয়েল জোক্।

ছয়

আলমোড়ায় আমি আর একবার থেনতুপ লামাকে একান্তে পেয়েছিলাম। সকাল বেলায় কৈলাস যাত্রার ব্যবস্থা করে যখন আমরা কোথাও যাব ভাবছিলাম, সেই সময়ে লামাকে দেখতে পেয়েছিলাম দূরে। আর কেউ দেখতে পেয়েছিলেন কি না জানি না। বলেছিলাম: এইবারে একটুখানি ছুটি চাই, সময় মতো ঘরে ফিরব।

মায়া তাকিয়েছিল চারিধারে, কিছু দেখেছিল কিনা জানি না, বলেছিল: আফিঙখোর।

আর কেউ তার এই মন্তব্য বুঝতে পারে নি, কিন্তু আমি পেরেছিলাম। বলেছিলাম: হ্যাঁ, নেশার সময় হয়েছে।

তারপরে হনহন করে হেঁটে লামার কাছে পৌঁছে গিয়েছিলাম।

সে আসছিল রামকৃষ্ণ কুটীরের দিক থেকে। তাকে আবার আমি সেই দিকেই ফিরিয়ে নিয়ে গেলাম। তা না হলে আবার সবার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে যেত। খানিকটা এগিয়ে যেতেই শহরের কোলাহল শেষ হয়ে গেল, ফুরিয়ে গেল দোকান-পাট আর লোকজনের আনাগোনা। বললাম: আসুন না, এই নিরিবিলিতে একটুখানি বসি।

লামা কোন কথা কইল না, কিন্তু আমার পাশে এসে বসল।

বললাম: আজ আপনাকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছে।

লামা এ কথা অস্বীকার করল না, বলল: আজ সারা দিন মনটা ভার হয়ে আছে।

কেন?

কাল আপনার কাছে আমার জীবনের অনেক কথা বলে ফেলেছি। ইচ্ছে করছে, সে সব কথা ফিরিয়ে নিই।

কথা কি ফিরিয়ে নেওয়া যায়!

যায় না বলেই তো আজ আমার মন এমন ভারি লাগছে।

আমি বললাম : সবটুকু বলে ফেললেই মন হাল্কা হয়ে যাবে।

কিন্তু এ কথায় লামার বিশ্বাস হল কিনা বুঝতে পারলাম না। সে আগের মতোই গম্ভীর হয়ে রইল।

আলমোড়ার আকাশে তখন সকালের রৌদ্র ঝলমল করছে। কিন্তু এ দিকটায় উত্তাপ লাগছে না। অল্প অল্প বাতাস আসছে ঝাউগাছের ফাঁক দিয়ে। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আমি তাকে তার পুরনো গল্পের মধ্যে টেনে আনবার চেষ্টা করলাম। বললাম : কাল রাতে আমি আপনার কথা অনেক ভেবেছি। এ দেশে জন্মালে আমরা হয়তো আপনাকে প্রগতিশীল বলতাম, কিন্তু বিপ্লবী বলে ভয় পেতাম না। আপনার মঠের লামারা আপনাকে রীতিমতো ভয় পেয়েছিলেন।

অন্যমনস্ক ভাবে লামা বলল : হয়তো তাই।

একটু থেমে বলল : হয়তো ছ্যাতেনকেও তারা একটা ষড়যন্ত্রের মধ্যে টেনে নিয়েছিল। আমি বুঝতে পারি নি।

আস্তে আস্তে থেনদুপ লামা তার জীবনের কাহিনীর মধ্যে ডুবে গেল।

টাশি থেনদুপ যে বড় হয়েছে, একদিন বড় লামাও এ কথা মেনে নিলেন। থেনদুপ এ কথা বুঝতে পারল সেদিন, যেদিন বড় লামা তাকে ডেকে বললেন, ওরে, একটা মঠের ভিতরে কারও শিক্ষা কোন দিন সম্পূর্ণ হয় না। এ একটা কূপে বাস করে পৃথিবীর আস্বাদ নেবার মতন মুখ বাড়িয়ে আকাশের একটুখানি জায়গাই দেখা যায়। কিন্তু পৃথিবীর যেমন শেষ নেই, জ্ঞানেরও তেমনি। শিক্ষা সম্পূর্ণ করবার জন্যে বাইরে বেরুতে হয়।

থেনদুপ ভারি আশ্চর্য হল। আজ কদিন ধরে তারও ঠিক এই কথাই মনে হচ্ছিল। ভয়ও পাচ্ছিল। বড় লামার কাছে

সে কেমন করে এই কথা বলবে। আজ তার বয়স কুড়ি পেরিয়ে গেছে। পাঁচ বছর থেকে সে মানুষ হয়েছে বড় লামার স্নেহ ও যত্নে। তার সঙ্গী হয়ে যারা এসেছিল, তারা কবে তাদের বাপমায়ের কাছে ফিরে গেছে। নতুন ছেলে এসেছে, তারাও গেছে ফিরে। তার মত দু একজন মাত্র রয়ে গেছে লামা হবার জন্য। আর একজন বয়স্ক মানুষ এসেছেন সংসার ত্যাগ করে। থেনডুপ লক্ষ্য করেছে যে এরা কেউই কিছু শেখবার জন্য আসে নি। এসেছে লামা সেজে লামার সম্মান ও নিশ্চিন্ত জীবনটুকু উপভোগ করতে। এ সব কথা ভাবলে থেনডুপের কান্না পায়।

বড় লামা বলছিলেন, বুদ্ধ তো সৃষ্টিছাড়া মানুষ ছিলেন না। জ্ঞানে তিনি বুদ্ধ হয়েছিলেন। সমস্ত জ্ঞান অর্জন করে আজও মানুষ বুদ্ধ হতে পারে।

থেনডুপের রোমাঞ্চ জাগল এই কথা শুনে। আজ তার প্রথম মনে হল যে সে কিছুই এত দিন শেখে নি। জ্ঞানের প্রথম কথাটিই শেখে নি এত দিন। বছর কয়েক আগেও সে বড় লামার সঙ্গে 'বড় হয়েছি' বলে তর্ক করত। বড় লামা যে তার চেয়ে ঢের বড়, সে কথা আজ তিনি প্রথম প্রমাণ করে দিলেন। থেনডুপের আজ চেঁচিয়ে কাঁদতে ইচ্ছা হল।

কী হল রে?

থেনডুপের মুখের দিকে তাকিয়ে বড় লামা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

কিন্তু থেনডুপ কোন উত্তর দিতে পারল না।

বড় লামা বললেন: ভয় কি. আজ থেকে তুমি আমার ঘরে শোবে, আমার পাশে।

বিস্ময়ে থেনডুপ অভিভূত হয়ে গেল, বলল, ভয় পাব কেন!

আমিও তো তাই বলছি, ভয় পাবার কোন দরকার নেই।

কিন্তু এই উত্তরে থেনডুপ সন্তুষ্ট হতে পারল না। সে বেশ

বুঝতে পেরেছে যে ভয় পাবার মতো কোন ঘটনা বড় লামার কানে পৌঁছেছে। তা না হলে এ কথা তিনি কেন বলবেন!

থেনডুপ একবার অনুরোধ করল, কী হয়েছে বলবেন না?

চোখ বুজে বড় লামা হাসতে লাগলেন।

থেনডুপ বুঝল যে এর বেশি আর কিছু তাঁর কাছে জানা যাবে না।

নিজের ঘরে এসে থেনডুপ ভাবতে লাগল। কিসের ভয়! কাকে ভয়! কেন তাকে ভয় পেতে হবে! তার এই ঘরটাও বড় লামা কেন নিরাপদ ভাবছেন না! থেনডুপের তো ভয়-ডর বলে কিছু নেই। তবে কি বড় লামা অন্য কোন আশঙ্কা করছেন! তার প্রাণের আশঙ্কা! কিন্তু কেন তিনি এমন আশঙ্কা করবেন! থেনডুপ তো কোন অন্যায় করে নি!

কাল সকালবেলায় ছ্যুতেন তার কাছে এসেছিল। অনেকক্ষণ গল্প করেছিল তার সঙ্গে। তার বিবাহের বয়স হয়েছে। দেখতেও হয়েছে ভারি সুন্দর। ছ্যুতেন জানতে চাইছিল, কেন সে এখনও মঠ ছাড়ছে না, কবে সে বাড়ি ফিরবে! বলেছিল, অনেক দিন তো তার মঠে কাটল, লেখাপড়াও করল অনেক। এখন বাড়ি ফিরে সংসার করতে বাধা কী!

থেনডুপ এ সব কথার কোন উত্তর দেয় নি। সে বলেছিল অন্য কথা, এখন তোমার কিছু শিখতে ইচ্ছে করে না?

ছ্যুতেন হেসেছিল তার প্রশ্ন শুনে।

আর থেনডুপ বুঝেছিল তার হাসির মানে। বুঝতে পেরেছিল যে শৈশবের কথা ছ্যুতেনের আজও মনে আছে, মনে আছে সেই সব বোকার মতো কথা। সে বোকা না হলে কি আর লামা হবার কথা ভাবতে পারত! ছ্যুতেন আজ লজ্জা পাচ্ছে তার শৈশবের বোকামির জন্যে।

থেনডুপের সন্দেহ হয়েছিল যে ছ্যুতেনের এখন বোধহয় অন্য

কোন ফন্দী মাথায় আছে। তাইতেই সে কিছু দিন থেকে কারণে অকারণে উঠে আসছে মঠের ভিতর। এটা সেটা উপহার আনছে থেনহুপের জন্যে। কাল এনেছিল দুধের শক্ত বড়ি। লুকিয়ে তার হাতে দিয়ে বলেছিল, তোমার জন্যে এনেছি।

কুমড়ো বড়ির মতো সাদা দুধের বড়ি। চিবিয়ে খাবার উপায় নেই, সেদ্ধ করেই খেতে হয়। চুষে খেতে থেনহুপের ভাল লাগে না। সে কথা সে ছ্যুতেনকে জানিয়ে দিয়েছে। এও জানিয়েছে যে, কোন উপহার দিতে হলে মঠকে দেবে। কোন লামাকে দেওয়া উচিত নয়। ছ্যুতেন এ সব কথা মানে না।

এক একদিন ছ্যুতেন তার বিয়ের গল্প শুরু করে দেয়। কত ভাল ভাল সম্বন্ধ আসছে, সেই সব গল্প। একটা সম্বন্ধ এসেছে, তারা পাঁচটা পিঠোপিঠি ভাই, পাঁচজনই রোজগেরে। ছ্যুতেনের মতো সুন্দরী মেয়ের লোভে এখনও বিয়ে করে নি। ঐ পাঁচজনের হাতে পড়লে ছ্যুতেনের আর কোন দুঃখই থাকবে না।

তবে বিয়ে করছ না কেন?

জানতে চায় থেনহুপ।

উত্তরে ছ্যুতেন হাসে। ছোট ছোট চোখ আরও ছোট করে অদ্ভুত রহস্যময় হাসি হাসে। থেনহুপের মনে হয় যে ছ্যুতেন তাকে ঠাট্টা করছে তার অজ্ঞতার জন্য, তার নির্বুদ্ধিতার জন্য। লেখাপড়া শিখলে মানুষ বুঝি এমনিই নির্বোধ হয়!

ছ্যুতেনের এই হাসিটা থেনহুপের পরিচিত মনে হয় না। বলে, ভাল সম্বন্ধ সব সময় পাওয়া যায় না ছ্যুতেন, দেরি করা বোধহয় ঠিক হবে না।

থেনহুপ যে দিনে দিনে বোকা হয়ে যাচ্ছে, ছ্যুতেনের তাতে আর সন্দেহ রইল না। বলল, ভাবছি, একটা লামাকে ধরা যায় কি না।

কেন যাবে না! তোমার বিয়েতে আমি আমাদের বড় লামাকেই ধরে নিয়ে যাব। সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।

উত্তর শুনে ছ্যুতেন খিলখিল করে হেসে উঠল, আর বড় করুণ দেখাল থেনতুপকে। অপ্রতিভ ভাবে বলল: এতে হাসবার কী হল?

হাসব না! ঐ বুড়োকে বিয়ে করবে কে?

থেনতুপ এবারে ক্ষেপে গেল, বলল: বিয়ে করবে কেন! লামাকে কেউ বিয়ে করে, না লামা যায় কাউকে বিয়ে করতে!

হাসতে হাসতেই ছ্যুতেন বলল: আমি তো বিয়ের কথাই বলছি। কোন রকমে একটা ছোকরা লামাকে কি ভুলিয়ে ভাগিয়ে নিয়ে যেতে পারব না!

বলে নিজের দেহের দিকে তাকাল। ঢিলেঢালা ছুব্বার ভিতর তার দেহের রূপ আছে লুকনো। বাহিরে শুধু কৌতুকে উজ্জ্বল একখানা চৌকো মুখ। এবারে থেনতুপের আর বুঝতে কিছুই বাকি রইল না। গম্ভীর ভাবে বলল: এখন তুমি যেতে পার ছ্যুতেন, আমার অনেক কাজ আছে।

বলে সে নিজেই ছ্যুতেনের কাছ থেকে সরে গেল।

সেদিন রাত্রে থেনতুপের ঘুম আসছিল না। শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছিল। মেয়েরা কত ছলই না জানে! কত ছল জানে ঐ মেয়েটা। এত দিন সে সব কিছুই ভুলেছিল। ভাল ছিল। হঠাৎ আজ ক দিন থেকে মেয়েটা ঘোরাঘুরি শুরু করেছে। থেনতুপের বিশ্বাস হয় না যে শৈশবের মন এখনও তার সজীব আছে। তার তো নেই।

খুব সাবধানে পা ফেলে শিতেন এল ঘরে। শিতেনও তার মতো লেখাপড়া শিখতে এসেছে। ছেলেমানুষ। তার চেয়ে অনেক ছোট। কিন্তু খুব সরল ভালমানুষ এই ছেলেটি। ভাল লাগা জিনিসটা বুঝি সংক্রামক। যাকে ভাল লাগে, তারও ভাল লাগে। শত্রুতার বেলাতেও তেমনি। কারও প্রতি বিদ্বেষ থাকলে বুমেরাঙের

মতো সেই বিদ্বেষ আসে ঘুরে। শিতেনকে থেনডুপের ভাল লাগে। তাই খুশি হল তার আগমনে। বলল, ঘুমোও নি এখনও?

না।

শিতেন তার কাছে এসে বসল। কিন্তু আর কিছু বলল না।

থেনডুপ বলল, বাড়ির জন্যে মন খারাপ করছে বুঝি?

শিতেন কোন উত্তর দিল না।

থেনডুপ তাকে একটা ঠেলা দিয়ে বলল, চুপ করে রইলে যে।

অসঙ্কোচে শিতেন বলল, আমার বড় ভয় করছে।

ভয় কিসের?

কিন্তু এ কথারও উত্তর দিল না স্বল্পভাষী শিতেন।

বল না, আমি তো কাছেই আছি।

ভয়ে ভয়ে শিতেন বলল, তোমার জন্যেই তো ভয়!

আমার জন্যে!

কদিন থেকেই আমার কেমন ভয় করছে। তোমার নাম শুনতে পাচ্ছি সবার মুখে।

সে তো ভাল কথা রে!

শিতেন উঠে দাঁড়িয়েছিল, বলল, দরজাটা তুমি বন্ধ করে শুয়ো।

থেনডুপ হাসল তার ভাবনা দেখে। হাসল, কিন্তু দরজাটা বন্ধ করতেও ভুলল না। বড় লামার কথাও তার মনে পড়েছে। তিনি তাকে নিজের ঘরে রাখতে চেয়েছিলেন। খানিকটা সাবধান হবার প্রয়োজন হয়েছে নিশ্চয়ই।

নিষুতি রাতে থেনডুপের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, কেউ দরজা খুলে ঢোকবার চেষ্টা করছে। ঘরে বাতি নেই, বাইরে থেকেও কোন আলো আসছে না। শুধু শব্দ আসছিল। মনে হচ্ছিল, বাইরে কারা কথা কইছে অস্পষ্ট ভাবে। থেনডুপ নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে জেগে রইল। নেপথ্যের মানুষেরা চলে না গেলে হয়তো

আরও অনেকক্ষণ জেগে থাকত। থেনতুপ বুঝতে পেরেছিল যে যারা এসেছিল, হঠাৎ তারা পালিয়ে গেল। কাকে দেখে তারা পালাল! বড় লামা কি ঘুরে বেড়াচ্ছেন!

পরদিন সকালে বড় লামাই তাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, কাল আমার কথা না শুনে অন্যায় করেছ। আজ থেকে তুমি আমায় ঘরে শোবে, আমার পাশে।

থেনতুপ আজ তাঁকে কোন প্রশ্ন করল না। আজ সে নিঃসন্দেহ হয়েছে যে কোথায় একটুখানি তাল কেটে গেছে। তা না হলে তার জীবনের বীণা এমন বেসুরো বাজবে কেন! শুধু বেসুরো নয়, সাবধান হতে না পারলে কোন সুরেই হয়তো বাজবে না। তার উদ্ধত উন্মুখ জীবন কি এই ভাবেই শেষ হয়ে যাবে।

এর জন্য দায়ী কে? থেনতুপ নিজে তো কারও কোন অনিষ্ট করে নি। অনিষ্ট করা দূরে থাক, কারও অনিষ্টের চিন্তাও করে নি। তবে কেন সে কারও বিরাগের কারণ হবে! কেন তাকে তার জীবন বিপন্ন বলে ভাবনায় অস্থির হতে হবে!

ছ্যাতেন কি এই সমস্ত গণ্ডগোলের মূলে। কিন্তু তাই বা কী করে সম্ভব হয়! শিতেন অবশ্য এমনই কিছু সন্দেহ করেছে। লামাদের মধ্যে একজন নাকি ছ্যাতেনকে খুব পছন্দ করেন. কিন্তু ছ্যাতেন তাঁকে আমল দেয় না। হঠাৎ আজ ক'দিন ধরে সে আসছে থেনতুপের কাছে, উপহার আনছে নানা রকম। আঘাত একটু লাগে বৈকি!

থেনতুপ তার নিজের মনের কথাও ভাবে। তার দুর্বলতার কথা। ছ্যাতেনকে সে তো প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। উৎসবের দিনে যখন এসেছে, সে তা খেয়ালই করে নি। নিজে থেকে সে কখনও এগিয়ে আসে নি, থেনতুপও তাকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করে নি। যদি কখনও দেখেও থাকে তো আর দশটা ছেলে মেয়ের মতো একই

চোখে দেখেছে। ক দিন ধরে বারে বারে না এলে তাদের শৈশবের কথা হয়তো মনেই পড়ত না।

থেনডুপের আবার মনে পড়ছে, ছ্যুতেনের ছোটবেলার কথা। মঠে আসবার জন্য তখন সে ছটফট করত। বলত, লেখাপড়া শিখে সেও লামা হবে, দেশ থেকে দেশান্তরে যাবে। যে সমস্ত মেয়ে পড়তে চায় না, তাদের সবাইকে সে লামা করবে। তারপর পলদেন গোম্ফায় যখন তার ঠাঁই হল না, তখন নাকি সে দিনের পর দিন কেঁদেছে। তার কাছে এসেও সে কেঁদে গেছে। থেনডুপের মনে পড়ে, সে তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছে যে সে বড় লামা হলে আর কারও দুঃখ থাকবে না। সবাইকে সে থাকতে দেবে, মেয়েদেরও লামা হতে দেবে, জোর করে লামা করবে। থেনডুপের বয়স তখন পাঁচ, ছ্যুতেনেরও প্রায় ঐ বয়েস। থেনডুপের আজ এই কথা ভেবে আশ্চর্য লাগে যে শৈশবের সমস্ত কথা ছ্যুতেন বেমালুম ভুলে গেল। পাঁচ বছর বয়সটা কি নিতান্ত কম? তখনও কি কেউ অজ্ঞান থাকে! থাকলে সেও তো সব ভুলে যেত!

থেনডুপের হঠাৎ মনে পড়ল যে শৈশবের একটা বাসনা তার বুকে বিঁধে আছে। এত দিন সে বুঝতে পারে নি যে সেই কাঁটাটাই চলতে ফিরতে তাকে খচখচ করে ব্যথা দিত। নির্জনে রক্তপাত হত। থেনডুপ তা দেখতে পেত না। শিক্ষার এমন অভাব তার দেশে। পুরুষেরা শেখে না নিজের দোষে। কিন্তু মেয়েরা! তাদের যে কোন অধিকার নেই! শিখবার শখ হলে টুঁটি টিপে সেই শখকে হত্যা করতে হবে। দেশজোড়া কুসংস্কার আর শিক্ষার অভাব। এই অন্ধকারকে ঘনিয়ে রেখেছে এক দল স্বার্থপর মানুষ। একটা গোটা দেশকে অজ্ঞানে আবৃত রেখে তারা তার ফল ভোগ করে যাবে নির্বিরোধে। সেদিন শুধু উৎসবের পরে থেনডুপ এই সমাজ ব্যবস্থার প্রতিবাদ জানিয়েছে। শক্ত দৃঢ় প্রতিবাদ। থেনডুপ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, তার হাতে কোনদিন ক্ষমতা

এলে এর প্রতিকার সে করবেই, বাঁচবার জন্যে সবাইকে দেবে সমান অধিকার। রাজায় ও প্রজায় লামায় ও গ্রামবাসীতে পুরুষে ও নারীতে কোন প্রভেদ সে থাকতে দেবে না। বলেছিল, ভারতের সংঘারামে ভিক্ষুদের সঙ্গে ভিক্ষুণীও আছে। যে পুঁথিখানির ভিতর এই সংবাদ সে পড়েছে, সেখানাও সকলকে দেখিয়ে দিয়েছে। সেদিন বড় লামা তাকে থমিয়ে না দিলে সে আরও অনেক কিছু বলতে পারত।

থেনডুপের মনে পড়ল, ঠিক এই সব কথা কোন উৎসবে না বললেও অনেকবার অনেকের সামনে সে বলেছে। কিন্তু এ কি কোন অপরাধের কথা! সে তো দেশেরই মঙ্গল চায়। মঙ্গল চায় দেশবাসীর। মঙ্গল চাইলে তাকে কেন শাস্তি পেতে হবে!

রাত্রে বড় লামা তাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, তোমার বিছানাটা নিয়ে এস।

হতবুদ্ধির মত থেনডুপ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

বড় লামা বললেন, তোমাকে বলি নি, এখন থেকে রোজ রাতে তুমি আমার ঘরে শোবে, আমার পাশে।

থেনডুপ প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, তার কি দরকার আছে! আমি তো ভয় পাই নে!

বড় লামা গম্ভীর স্বরে বললেন, তুমি পাও না, কিন্তু আমি পাই।

বিছানা আনতে গিয়ে থেনডুপ দেখল যে শিতেন তার ঘরে দাঁড়িয়ে আছে। বলল, বড় লামার ঘরে শোবে তো!

কী করে জানলি?

শুনতে পেলাম।

একটু থেমে বলল, এ ভালই হল।

বিরক্ত ভাবে থেনডুপ বলল, কেন?

শিতেন একেবারে কাছে ঘনিয়ে এল, বলল, সবাই ভাবছে,

একদিন তুমিই বড় লামা হবে। মনে মনে বড় লামার নাকি তাই ইচ্ছে। আর তুমি বড় লামা হলেই সর্বনাশ। ধর্ম নষ্ট হবে।

এই কথা!

বলে থেনডুপ একটা ভেংচি কাটল।

শিতেন বলল, ড্যুতেনকে বোধহয় ওরাই তোমার পিছনে লাগিয়েছে। যদি মঠ না ছাড় তো—

কী করবে?

শিতেন এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না। পালিয়ে গেল আর্তনাদ করে।

বড় লামার ঘরে ফিরে আসতেই তিনি বললেন, শুনতে পাচ্ছি, চীনে একদল লামা যাচ্ছেন ভারতবর্ষে!

ভারতবর্ষে!

থেনডুপ যেন লাফিয়ে উঠল।

বড় লামা মাথা নেড়ে বললেন, বুদ্ধের দেশেই যাচ্ছেন।

আমাকে কি তারা সঙ্গে নেবেন? যেতে দেবেন আপনি?

এক নিঃশ্বাসে থেনডুপ দুটো প্রশ্ন করে ফেলল।

উত্তরে বড় লামা হাসলেন। দু-চোখ তার বুঁজে গেল। থেনডুপ অনুভব করল যে, এই ব্যবস্থায় বড় লামার সম্মতি আছে। বলল, আমার উপরে আপনার অনেক দয়া।

পুরনো দিনের মতো থেনডুপকে বড় লামা কাছে টেনে নিলেন।

দেখতে দেখতেই কথাটা চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল। শিতেন এসে খবর দিল, সবাই খুব খুশী হয়েছে।

কেন বল তো?

শিতেন গম্ভীর হয়ে বলল, ভেব না যে তোমার ভাল হচ্ছে বলে খুশী হয়েছে।

তবে কি আপদ বিদেয় হল ভাবছে!

ওরা ভাবছে, রাস্তায় যদি বাঘে না খায় তো ভারতবর্ষের মানুষে খাবে। আর শাক্যমুনির দয়ায় যদি নিতান্তই ফিরে আস তো—

এরা আমায় খাবে।

বলে থেনতুপ হেসে উঠল অনাবিল আনন্দে।

শিতেন তাকে সংশোধন করে দিল, অন্তত পঞ্চদেন গোম্ফায় আর তোমাকে ঢুকতে দেবে না।

থেনতুপ দেখলে যে প্রচ্ছন্ন বেদনায় তার মুখখানা ম্লান হয়ে গেছে।

থেনতুপ বলল, দুঃখ কেন ভাই, পৃথিবীর এই তো নিয়ম। ভেড়ার পাল চলেছে, কি ইয়াকের দল দলের সঙ্গে সোজা পথ চল, কোন গণ্ডগোল নেই। এদিক সেদিকে মুখ করেছ কি ঠ্যাঙার গুঁতো।

থেনতুপ সম্প্রতি এই কথা বুঝেছে। শিতেনের মুখ দেখে মনে হল যে, সে এই কথা নতুন শুনছে। কিন্তু নতুন হলেও ঠিক নতুন বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন আলো-বাতাসের মত এও একটা অতি পুরনো কথা, পুরনো সত্য। বিশ্বাস করতে তার এতটুকু সন্দেহ জাগে না।

থেনতুপের খবর গোম্ফা থেকে গড়িয়ে নামল গ্রামের ভিতর। তার মা আজ বেঁচে নেই। অনেক দিন আগে তিনি মারা গেছেন। থেনতুপ তখন ছোট ছিল। খবর পেয়ে মঠ থেকে ছুটে গিয়েছিল মাকে দেখতে। মাকে সে দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু মা তাকে দেখতে পান নি। থেনতুপ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডেকেছিল। কিন্তু মা একবারও সাড়া দেন নি। অভিমানে থেনতুপ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল, মা তবু চোখ খোলেন নি। সবাই তাকে বুঝিয়েছিল যে, ডেকে আর লাভ নেই। ছোট মেয়েটি হয়ে মা এতক্ষণ অন্যের ঘর আলো করেছেন।

আরও অনেক কথা থেনতুপ শুনেছিল। সে সব বুঝতে পারে নি। শুনেছিল যে তার বাপেরাই তার মাকে মেরে ফেলল

অতগুলো মানুষে মিলে একজনের উপর অত্যাচার করলে কি চলে! আরও সব অনেক কথা। থেনতুপের ভাল লাগে নি সে সব শুনতে। সেখানে থাকতেও আর ভাল লাগে নি। গোম্ফায় ফিরে এসে আর কখনও তাদের বাড়ি যায় নি। কেউ তার খোঁজও নেয় নি বন ঘন। তার বাপেরা এসেছে ক্বচিৎ কদাচিৎ। এসেছে নিজেদের প্রয়োজনে।

থেনতুপের মনে হল যে তার মা বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই তিনি ছুটে আসতেন। কেঁদে চুল ছিঁড়ে বাধা দিতেন তাকে। বিদেশীদের সঙ্গে ছেলে বিদেশ যাবে একা, এ তিনি কিছুতেই সইতেন না। সম্মতির জন্য থেনতুপকে বিপন্ন হতে হত। কিন্তু আনন্দ হত মায়ের সেই উদ্বেগ দেখে। মায়ের সেই ভাবনা বেদনা সেই স্নেহের স্পর্শ, সেইটুকু কল্পনা করে আজ তার রোমাঞ্চ হল।

মায়ের বদলে এল ছ্যাতেন। বলল, তুমি নাকি ভারতবর্ষে যাচ্ছ?

গম্ভীর ভাবে থেনতুপ বলল, হ্যাঁ।

আর ফিরবে না?

জানি নে।

তুমি না বড় লামা হবে?

থেনতুপ আশ্চর্য হয়ে বলল, কে বলেছে এ কথা?

ছ্যাতেন বলল, বড় লামার সঙ্গে তুমি ব্যবস্থা করেছ শুনলাম।

থেনতুপ বিহ্বল চোখে তাকাল ছ্যাতেনের দিকে।

ছ্যাতেন তাড়াতাড়ি বলল, লামারা তো সবাই তাই বলছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে থেনতুপ বলল, সেই জন্যেই তো চলে যাচ্ছি।

আশ্চর্য হয়ে ছ্যাতেন বলল, তুমি কি তাহলে বড় লামা হতে চাও না?

চাইলেই কি তা হওয়া যায়! বড় লামা কত বড় লামা, কত

বিদ্যা কত জ্ঞান তাঁর। কিছু না শিখেই বড় লামা হলে সবাই হাসবে যে!

তুমি তো শুনেছি অনেক জান।

এই গোম্ফায় যা আছে, তা জানি। কিন্তু এখানে তো কিছুই নেই। যা শিখবার আছে, তা সবই বাইরে। সে সব না শিখলে চলবে কেন!

সব কিছু শেখবার জন্যেই বুঝি তুমি ভারতবর্ষে যাচ্ছ!

থেনতুপ মাথা নাড়ল।

ছ্যাতেন জিজ্ঞাসা করল, ভারতবর্ষটা কি লাসার কাছে?

তারপর নিজেই নিজের ভুলটা শোধরাল, না না, তা কী করে হবে। লাসা তো এই দিকে, আর তোমরা শুনলাম অন্য দিকে যাবে।

বলে দক্ষিণে হাত বাড়াল।

এক মুহূর্ত থেমে বলল, ভারতবর্ষে কি আমাদের মতো মানুষ আছে?

থেনতুপ হাসল তার প্রশ্ন শুনে।

অপ্রতিভ ভাবে ছ্যাতেন বলল, হাসলে যে?

বুদ্ধদেবের দেশ ভারতবর্ষ। সেখানে মানুষ থাকবে না তো কি তিব্বতে থাকবে!

থেনতুপ ছ্যাতেনকে এই কথা অকপটে বলল। কিন্তু বলেই ভাবল, তার ভুল হয়েছে। ভারতবর্ষ নামে যে একটা দেশ আছে, আর সে দেশ যে দক্ষিণে, এইটুকু জানাই অনেকের কাছে অনেক জানা। চীনের লামারা এদিকে না এলে ভারতবর্ষ নামটাই অনেকে শুনত না। থেনতুপের বুকের ভিতর এক রকমের অদ্ভুত বেদনা সহসা গুমরে উঠল।

সবিস্ময়ে ছ্যাতেন বলল, কেন সে দেশে লোক যায়?

থেনতুপ এ কথার উত্তর খুঁজে পেল না। বহু লামার মুখে সে

চীনের বড় বড় লামার গল্প শুনেছে। পুরাকালে তাঁরা ভারতবর্ষে যেতেন পড়াশুনা করতে। সেখানে লামাদেরও শিক্ষার ভাল ব্যবস্থা ছিল। আজও সে রকম ব্যবস্থা আছে কি না, থেনডুপ তা জানে না। তা না জানুক। শাক্যমুনির জন্মের দেশ যে কোন দিন অন্ধকার হবে না। এ বিষয়ে তার সন্দেহ নেই।

ছ্যুতেন বলল : উত্তর দিচ্ছ না যে!

ছোট ছেলের মতো থেনডুপ বলল, কী বলব ভেবে পাচ্ছি না।

তুমি কেন যাবে?

আমি! আমি পড়তে যাব।

তারা তোমায় পড়তে দেবে তো?

কেন দেবে না?

ছ্যুতেন থেনডুপের খুব কাছে ঘেঁষে এল। বলল, সবাই কী বলছে জান? বড় লামা নাকি তোমাকে অনেক টাকা দেবেন।

টাকা! টাকা নিয়ে আমি কী করব।

ছ্যুতেন হাসল, বলল, তুমি এখানেই থাক, কোথাও গিয়ে তোমার কাজ নেই।

এ যে পরিহাসের কথা, থেনডুপ তা বোঝে। তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে বলল, আমার অনেক কাজ আছে ছ্যুতেন, আমি যাই।

কাজ সকলেরই আছে, কিন্তু সকলে পালায় না।

সন্ধ্যাবেলায় শিতেন এল থেনডুপের কাছে, বলল, তুমি নাকি মঠের সব টাকা সঙ্গেই নিয়ে যাবে?

আমি! কে বলল এ কথা?

সবাই বলছে, সবাই তো জানে।

কই, আমি তো কিছু জানি না।

সত্যিই জান না।

শিতেন আশ্চর্য হয়ে থেনডুপের মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে

রইল। তারপরে বলল, কিন্তু এ কথা তো কেউ বিশ্বাস করবে না। সবাই কি বলছে জান? বলছে, বড় লামার সঙ্গে ভাব করে তুমি সব লুটে নেবে।

কিন্তু টাকার তো আমার দরকার নেই।

তবে তুমি ভারতবর্ষে যাবে কী করে!

ছেলেমানুষের মতো থেনডুপ জিজ্ঞাসা করল, টাকা না থাকলে বুঝি ভারতবর্ষে ঢুকতে দেয় না?

শিতেন বলল, সেখানেও কি এমন গোম্ফা আছে যে তোমাকে দিনের পর দিন বসিয়ে খাওয়াবে!

চিন্তিত ভাবে থেনডুপ বলল, তাহলে আমি কোথায় এত টাকা পাব?

শিতেন খুব কাছে সরে এল, বলল, বড় লামা তো তোমাকে সব দেখিয়ে দিয়েছেন!

কী দেখিয়েছেন?

যেখানে টাকা থাকে, সোনা-দানা মণিমুক্তো!

গভীর বিস্ময়ে থেনডুপ হতবুদ্ধি হয়ে গেল। শিতেন আজ পাগলের মত এ সব কী বলছে! কিন্তু শিতেনের ঝুলিতে তখন আরও খবর ছিল। বলল, জান, লামারা সবাই রাত জাগছে। বলছে, বড় লামার জারিজুরি এবারে সব ধরে ফেলবে। কত হাজার বছরের পুরনো এই গোম্ফা, কত সোনা-দানা, কত ধন রত্ন। বুড়ো কাউকে কিছু জানতে দেয় না। কোন সময়ে কোথা থেকে সে-সব বার করেন, কেউ আজ পর্যন্ত তা দেখে নি। এবারে লামারা কড়া পাহারা লাগিয়েছে। তোমার জন্যে তো একদিন খুলতেই হবে। সেদিন সব ধরে ফেলবে।

ওরা এসব জেনে কী করবে?

শিতেন বলল, সে কথাও ওরা বলাবলি করছে। মঠে এসে ঢুকেছে বলে তো বুড়ো লামার মতো মরে থাকতে চায় না। টাকার

হদিশ পেলে ওরা সেই টাকায় ফূর্তি করবে, জীবনটাকে উপভোগ করবে।

থেনতুপের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

শিতেন বলল, কী হল ?

থেনতুপ গম্ভীর হয়ে বলল, মনে হয় যে এই জন্যেই বোধহয় বড় লামা ওদের কিছুই বলেন না।

শিতেন বলল, তোমাকে বলেছেন তো ?

জিজ্ঞেস করলে নিশ্চয়ই বলবেন।

শিতেনের ঠিক বিশ্বাস হল না এই কথা। থেনতুপকে বড় লামা নিশ্চয়ই সব বলেছেন। সারাদিন তো দুজনে এক সঙ্গে কাটান, কত কথা বলেন, কত গল্প করেন। এ সব কথা কি তাদের হয় নি! বড় লামা তো খুব বুড়ো হয়েছেন। আজ আছেন, কাল থাকবেন কিনা কেউ জানে না। তবু তিনি কাউকে কিছু বলেন নি, এমন হতেই পারে না।

থেনতুপ ভারি চালাক, তাই সব কথা গোপন করে যাচ্ছে। শিতেন বলল, কিন্তু তোমার কথা যে আমারও বিশ্বাস হচ্ছে না ভাই।

কেন ?

কেউ বিশ্বাস করছে না।

কী বলছে সবাই ?

বলছে, তোমাদের দুজনকেই দেখে নেবে। তার আগে বার করতে চায় চোরা কুঠরির সন্ধান। ও চাবি পেলেই বড় লামা হবার আর কোন বাধা থাকবে না।

শিতেনের কথা শুনে থেনতুপের বিস্ময়ের আর শেষ নেই। এতটুকু ছেলে শিতেন আজ এত কথা জেনে ফেলেছে! অথচ তার চেয়েও আগে এসেছে সে এই গোম্ফায়। কিন্তু এ সব কথা তার মনে কোন দিন আসে নি।

শিতেন বলল, তোমার সঙ্গে বড় লামার যত ভাব বাড়ছে, সবার আক্রোশও বাড়ছে তত। কিন্তু চোরা কুঠরির হদিস পায় নি বলে কিছুই এখন করতে পারছে না।

হদিস পেলে কী করবে?

শিতেন বুঝি শিউরে উঠল, বলল, সে আমি জানি না।

বড় লামা জানেন এ সব কথা?

জানলে ওদের লু বানিয়ে দেবেন, বড় বড় লোমওয়ালা ভেড়া।

সত্যি?

সত্যিই তো, লামারাই বলছিল। এই বড় লামা তখন ছোট। পুরনো বড় লামার সঙ্গে থেকে থেকে মন্তর-তন্তর সব শিখে নিয়েছিলেন। চোরা কুঠরির চাবিটি পর্যন্ত নিজের কাছে রাখতেন। তারপর পুরনো বড় লামা মরবার পর অনেকে নাকি আপত্তি তুলেছিল। একদিন দল বেঁধে রাতে এসেছিল। ভেবেছিল, ভয় দেখিয়ে সব জেনে নেবে।

তারপর?

তারপর আর কী! ওদের দেখেই বড় লামা হাসলেন। হাতের মণিচক্র একবার কপালে ঠেকিয়ে ঘোরাতে লাগলেন। আর যে তাকে ধরতে এল, তার গায়েই ছুঁইয়ে দিলেন মণিচক্র। ছোঁয়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই সে ভেড়া হয়ে গেল।

থেনডুপ অবিশ্বাসের হাসি হেসে বলল, দূর!

সত্যি। পরদিন নাকি একপাল ভেড়া এই গোম্ফা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

থেনডুপ হাসতে হাসতে বলল, ওরা নিজেরা ভেড়া কি না, তাই ওরা নিজেদের গল্পই বলেছে।

তুমি বিশ্বাস করছ না তো, বড় লামা অনেক মন্তর-তন্তর জানেন।

জানেন বুঝি!

শিতেন আরও কাছে সরে এল, বলল, ভেড়া বানানো তুমি শিখে নিয়েছ তো ?

বানাবো তোমাকে ?

না না, আমাকে কেন। আমি কোন দিন তোমার কোন ক্ষতি করব না। তুমি বড় লামা হলে আমি একাই তো খুশী হব।

থেনতুপ তার ছুব্বার ভিতর থেকে মণিচক্রটা বার করেছিল। এবারে সেটা ভিতরে রেখে দিল।

আশ্বস্ত হয়ে শিতেন বলল, এ সব কথা তুমি কাউকে বলো না যেন।

কোন্ কথা ?

এই যে তোমাকে আমার খুশী হবার কথা বললাম !

কী হবে বলে দিলে ?

গলা টিপে ওরা আমায় মেরে ফেলবে।

তোমাকে ভয় দেখায় বুঝি ?

এক দিন দেখিয়েছিল।

কেন ?

যেদিন ওরা তোমাকে মারবার কথা বলছিল। আমি ছিলাম সেখানে। আমাকে বলল, খবরদার, থেনতুপ যদি একটা কথা জানতে পারে তো তোর গলা টিপে মেরে ফেলব

সেই ভয়ে বুঝি তুমি আমায় কিছু বল নি ?

সহসা একটা শব্দ পেয়ে শিতেন চমকে উঠল, ভয়ে ভয়ে বলল, আমি পালাই এবার।

বলেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

সাত

পিথোরাগড় উত্তর প্রদেশের নতুন জেলা। মোটর চলাচলের পথও নতুন তৈরি হয়েছে। একখানি গাড়ি এই পথে চলতে পারে। তাই ওয়ান-ওয়ে ট্রাফিক। সকাল সাড়ে ছটায় আলমোড়া থেকে একখানা আর পিথোরাগড় থেকে আর একখানা বাস ছাড়ে। মাঝ পথে একখানা বাসকে আর একখানার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। তারপরে আবার দুটো বাসই অগ্রসর হয়। পৌঁছয় দুপুর আড়াইটেয়। পিথোরাগড়ে অপেক্ষা না করে আমরা আসকোটে গিয়ে উপস্থিত হলাম। মোটরে আলমোড়া থেকে পিথোরাগড়ের দূরত্ব চুয়াত্তর মাইল। কিন্তু কৈলাস যাত্রীরা যখন পায়ে হেঁটে আলমোড়া থেকে আসকোটে আসতেন তখন তাঁদের উনসত্তর মাইল পথ হাঁটতে হত, সময় লাগত পাঁচ দিন।

আসকোটে আমরা ধর্মশালায় উঠেছিলাম। কৈলাসের পথে যে আমরা এ রকমের দোতলা ধর্মশালায় আশ্রয় পাব, এ আশা আমাদের ছিল না। এ ধর্মশালা বোধহয় আগেও ছিল। কেন না খুব নতুন তৈরি বলে মনে হল না। সমৃদ্ধ গ্রাম, অনেকগুলি দোকানপাট আছে, অনেক ঘর-বাড়ি। পাহাড়ের মাঝখানে একটি প্রশস্ত জায়গা জুড়ে এই গ্রাম, মাঝখান দিয়ে যাতায়াতের প্রধান পথ।

ধর্মশালার উত্তরে পাহাড়ের গায়ে দুখানা সুন্দর বাড়ি, ও অঞ্চলের রাজওয়ারা সাহেবের। এই ধর্মশালাটিও নাকি এই রাজওয়ারা সাহেবেরাই তৈরি করে দিয়েছেন। জন্ম এঁদের কতুর নামে এক রাজবংশে। এখন এঁরা সরকারী চাকরিতে যোগ দিয়েছেন। কে একজন বলেছিলেন যে এই কতুর বংশের পালবাহাদুররা বখতিয়ার খিলজীর সময় ঢাকা-বিক্রমপুর থেকে এখানে পালিয়ে এসেছিলেন। সেখানে তাঁরা পালবংশীয় রাজা ছিলেন বলে এখানেও তাঁদের পাল-

বাহাদুর নাম রক্ষা করে চলেছেন। এ কথায় কোন সত্য আছে কি না কেউ বলতে পারেন না।

পিথোরাগড়ে ছিল চাঁদ রাজাদের দুর্গ। এখন সে দুর্গ আর নেই, সেখানে হয়েছে সরকারী কোর্ট কাছারি। চাঁদ রাজাদের ইতিহাসও লোকে আজ ভুলে গেছে। জগতে ইতিহাস বড় নয়, বড় কীর্তি। ইতিহাস লোকে ভুলে যায়, কিন্তু কীর্তিকে ভোলে না। যে যুগে কীর্তি নেই, সে যুগের ইতিহাস ডুবে যায় বিস্মৃতির জলে।

আমাদের দলপতি মিস্টার ধীর মালপত্র কিছুই খুলতে দিলেন না। বললেন: এখানে দোকান আছে, দোকান থেকেই আমরা কিনে খাব।

মিসেস ধীর বললেন: জিনিসপত্র কিনলে আপত্তি করব না, কিন্তু খাবারটা তৈরি করেই খাব।

মিস্টার ধীর এই প্রতিবাদ পছন্দ করলেন না, কিন্তু বাধাও দিলেন না। বললেন: আসুন মিসেস মাথুর, আমরা যাত্রার ব্যবস্থা করে আসি।

বলে দুজনে বেরিয়ে গেলেন। তাঁদের সঙ্গে মিস্টার মাথুরও গেলেন।

মায়া আমাকে লক্ষ্য করে বলল: লামাকে কোথাও দেখতে পেলাম না।

আমি গম্ভীর ভাবে বললাম: লামা বোধহয় আলমোড়াতেই রয়ে গেল।

কেন?

খুব ভয় পেয়েছে। ছ্যাতেন নামে সেই মেয়েটার হাতে এমন নাকানি-চোবানি খেয়েছে যে এখন কোন অবিবাহিতা মেয়ে দেখলেই ভয়ে কাঁপে। ঘরপোড়া গরু কি না, তাই সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ডরায়।

মায়া সকৌতুকে বলল: আপনি ভয় পান না কেন?

কে বললে আমি ভয় পাই নে?

কই, ভয়ের তো কোন লক্ষণ দেখছি নে।

কী করে দেখবেন! ভয় তো বুকের ভিতরের জিনিস, মুখের হাসি দিয়ে আমরা তা ঢেকে রাখি।

মায়া হারবার পাত্রী নয়, বলল: তাহলে কি আপনিও ঘরপোড়া গরু নাকি?

এ প্রশ্নের জন্য আমি তৈরি ছিলাম না, একটু থমকে থেমে বললাম: অন্যের ঘরপোড়া দেখেছি কি না, আর থেনতুপ লামারও গল্প শুনছি।

এখনও শেষ হয় নি গল্প?

না, গল্পের শুরু হয়েছিল মাত্র।

তবে তো শেষটা আপনার শোনা হল না!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম: তাই তো দেখছি।

মায়া খুব গম্ভীর ভাবে কিছু ভাববার ভান করে বলল: তবে আসুন না, আপনার লামাকে একটু খুঁজে দেখে আসি।

বলে আমাকে এক রকম জোর করেই পথে নামাল। চলতে চলতে বলল: সত্যি কথা বলতে কি, আমার ভাবী বেচারী একটা বোকা ভালমানুষ। দেখলেন না, খানসামার রান্নাবান্নার সাহায্য করতে ধর্মশালাতেই রয়ে গেলেন।

আমি বললাম: মিসেস ধীরকে আমি বলে দেব।

সর্বনাশ! বলবেন না এ সব কথা। তার চেয়ে আসুন আপনাকে ভাল চা খাইয়ে দিচ্ছি।

ঘুষ নাকি!

হাসতে হাসতেই মায়া একটা চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসে পড়ল।

দুজনে বসে গল্প করতে করতে আমরা চা খেলাম। পয়সা দিল

মায়া বলল : এই সব উটকো শখের জন্যে পাথেয় কিছু নিজের সঙ্গে রেখেছি।

ছোট্ট গ্রামটি সম্পূর্ণ ঘুরে দেখতে আমাদের বেশিক্ষণ সময় লাগল না। পথেই দেখা হয়ে গেল মিস্টার ধীর এবং মিস্টার ও মিসেস মাথুরের সঙ্গে। তাঁরা সমস্ত ব্যবস্থা করে প্রসন্ন চিত্তে ধর্মশালায় ফিরছিলেন। আমাদের দুজনকে এক সঙ্গে দেখতে পেয়ে উল্লাস প্রকাশ করলেন

তাঁদের কাছেই খবর পেলাম যে ডাণ্ডির ব্যবস্থা হয়েছে দুখানা, আর সবার জন্যে ঘোড়া। আমাদের খানসামাও ঘোড়ায় যাবে। এ ব্যবস্থা মিস্টার ধীরের। তিনি খানসামাকে দলের শক্তির আধার মনে করেন। সে যতক্ষণ সুস্থ থাকবে, ততক্ষণ আর কারোর অসুস্থ হবার সম্ভাবনা নেই। পথে তারই একটু বেশি আরামের দরকার এবং সব চেয়ে ভাল ঘোড়াটি তাকেই দেওয়া হবে স্থির হয়েছে।

মায়া বলল : দুটো ডাণ্ডিতে কে কে যাবেন ?

মিস্টার ধীর বললেন : যিনি ডাণ্ডিতে যাবার প্রয়োজন বোধ করবেন, তিনিই যাবেন। দরকার মনে করলে আমরা খানসামাকেও ডাণ্ডিতে দিতে পারি।

আমি বললাম : ডাণ্ডির ক্যাণ্ডিডেট বেশি হলে ?

মিস্টার ধীর তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন : হয় পঞ্চায়েৎ বসবে, নয় লটারি।

মিসেস মাথুর বললেন : না, লীডারের আদেশ মানতে সকলে বাধ্য থাকবেন।

মিস্টার মাথুর বললেন : মানুষের চেয়ে ঘোড়ার সংখ্যা হল বেশি।

মিস্টার ধীর বললেন : তাতো হবেই। ঘোড়া আমাদেরও বইবে, আমাদের মালও বইবে।

আমি বললাম : আবার পুরুষেরা যা বয়, তাও বইবে।

মিসেস মাথুর বললেন : সে আবার কী ?

অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো মুখ করে বললাম : আমি মেয়েদের বইবার কথা বলছি। সে ভার তো পুরুষেরই ওপর।

মিস্টার ধীর অট্টহাস্য করে উঠলেন। আর মায়া চটে উঠল, বলল : আপনি যে বড় বিজ্ঞের মতো কথা কইছেন, মেয়েদের ব্যাপারে আপনার কী অভিজ্ঞতা আছে !

আমি বললাম : স্কুল-কলেজে পড়ে যদি শিক্ষা হয় তো অন্যের দেখে অভিজ্ঞতা হয় না !

মিস্টার ধীর বললেন : আলবৎ হয়।

মিসেস মাথুর বললেন : কথাবার্তা সব পুরুষেরই এক রকম।

আমি লক্ষ্য করে দেখেছিলাম যে কৈলাসের কঠিন যাত্রা আরম্ভ করবার পূর্ব পর্যন্ত আমরা এই প্রসঙ্গটিই সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছি। আমার মনে হল যে একটা দুরন্ত ভয় ছিল আমাদের মনে। রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াতে যে সাহসের দরকার তার অভাব লক্ষ্য করেই আমরা গল্পে ও ইতিহাসে ব্যস্ত থাকবার চেষ্টা করেছি।

তারপর ভয় ভেঙে গেল। মায়া আমাদের সঙ্গে ঘোড়ায় উঠল, ডাণ্ডিতে উঠলেন মিসেস ধীর ও মিসেস মাথুর। মিসেস মাথুর বললেন : ভয় পেও না মায়া, কষ্ট হলেই আমাকে ব'লো। আমি ঘোড়ায় উঠব। তোমার মতো বয়সে আমি কাশ্মীরে ঘোড়ায় চেপে বেড়াতাম।

মিস্টার মাথুর হেসে উঠেছিলেন।

মিসেস মাথুর বলেছিলেন : কেন গুলমার্গে উঠি নি ?

মিস্টার মাথুর বললেন : যাক সে কথা।

ঘোড়ায় চড়তে আমার খুব অস্বস্তি বোধ হয়েছে। সব সময়েই যেন পড়ে যাবার একটা ভয়। আর ঘোড়াগুলোর অভ্যাসও খারাপ।

তারা পাহাড়ের গা ঘেঁষে কিছুতেই চলবে না, তারা চলবে খাদের দিকে ঘেঁষে। চলে চলে সেদিকটাই সমতল হয়েছে, কিন্তু কেন এই দিকে চলে তা বুঝতে পারি না।

লোকালয় ছাড়িয়ে খানিকটা অগ্রসর হতেই আমাদের দলকে একটা ক্যারাভান মনে হল। এক একটা ডাণ্ডির জন্যে ছ জন কুলির দরকার। দুটো ডাণ্ডিতে বারোজন কুলি। তারপর আমরা পাঁচজন ঘোড়ার উপরে, আমাদের পিছনে সব মালবাহী ঘোড়া ও ঘোড়ার মালিকেরা সারি দিয়ে আসছে।

ধারচুলার পর থেকেই কৈলাসের আসল যাত্রার আরম্ভ। সেখান থেকেই যাত্রীরা একসঙ্গে চলবার চেষ্টা করেন কেউ আগে, কেউ পিছনে। কিন্তু রাত্রিবাস সকলে এক জায়গাতেই করেন। ঘুম থেকে যাঁরা আগে ওঠেন, তাঁরা আগে চলেন। অন্যরা অনুসরণ করেন তাঁদের। এক দলের লোকের সঙ্গে আর এক দলের লোকের দেখা-সাক্ষাৎ হয়। একজন যখন বিশ্রাম করতে বসেন, তখন আর একজন একটু মিষ্টি হেসে কিংবা দুটো কথা বলে এগিয়ে যান। নতুন পরিচয় হয়, পুরাতন পরিচয় হয় অন্তরঙ্গ। পথের আনন্দ পথের কষ্টকে কখনও বড় হতে দেয় না। কঠিন চড়াই ভাঙবার সময় ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করে। উৎরাই দেখে ঘোড়া থেকে নামতে ইচ্ছা করে স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য। জোঁকের অত্যাচার আর পিশুর কামড়ে জীবন অতিষ্ঠ মনে হবে মাঝে মাঝে। কিন্তু সে সব কথা নাকি মনে থাকবে না। অপার আনন্দ দিয়ে হিমালয় সেই পথের কষ্টের কথা পথেই ভুলিয়ে দেবে। দেশে ফেরবার পরে মনে একটা স্মৃতি জেগে থাকবে। সুখস্বপ্নের মতো আনন্দবহ এই স্মৃতি।

আসকোটের পরে একটা পাহাড় যেন ক্রমেই নিচু হয়ে গেছে। আমরা নামছি তো নামছিই। ঘোড়ায় চড়ে উৎরাই-এ এ পথ চলা যে কী কষ্ট তা এখানেই বুঝলাম। ঘোড়া থেকে নেমে যেন নতুন জীবন লাভের আনন্দ হল। তিন চার মাইল চলবার পরে গৌরীগঙ্গা

নদীর পুল দেখতে পেলাম। পঁচিশ ত্রিশ হাত চওড়া এই নদী উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হচ্ছে। দু দিকেই পাহাড় উঠেছে আকাশ পর্যন্ত। নদী পার হয়ে কিছু দূর চড়াই ভাঙবার পরে আমরা সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখলাম। ভারত ও নেপালের সীমান্ত দিয়ে বয়ে আসছে কালী নদী, তারপর জোলজুবি গ্রামের পাশে গৌরীগঙ্গার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। দূর থেকেই আমরা এই দুই নদীর মিলনের শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম।

এরপর থেকে কালী নদীর তীরে তীরে আমাদের পথ সোজা উত্তরে চলে গেছে। ভারতের মাটির উপর দিয়েই আমরা চলেছি। নদীর ওপারে হিমালয়ের এক গিরিশ্রেণী নেপালের সীমান্ত রক্ষা করছে।

আকাশ মাঝে মাঝে মেঘাচ্ছন্ন দেখছি। প্রথম আষাঢ়ের মেঘ। যে কোন মুহূর্তে বৃষ্টি নামতে পারে। কিন্তু বৃষ্টি নামল না।

রাতে আমাকে মায়া জিজ্ঞাসা করল: কই, আপনার লামাকে তো দেখতে পাওয়া গেল না।

আমি বললাম: বোধহয় আসে নি।

মায়া বলল: আমার তা মনে হচ্ছে না।

মায়ার অনুমানই ঠিক। ধারচুলায় পৌঁছে আমি লামার দেখা পেয়েছিলাম। সে কেমন করে আমাদের আগে এসে এখানে পৌঁছল তা জিজ্ঞাসা করি নি। আমি তার কাছে তার অসমাপ্ত জীবনের কাহিনী শুনতে চেয়েছিলাম। থেনডুপ লামা বোধহয় খুশী হয়েছিল আমার আগ্রহ দেখে, তারপর আর একটা পরিচ্ছেদ আমাকে শুনিয়েছিল।

আট

অন্ধকার রাত। মাখনের প্রদীপ জ্বলছে দু একটা ঘরে। পলদেন গোম্ফার আর সব ঘর অন্ধকার। সন্ধ্যার উপাসনা শেষ হবার পর খেয়েদেয়ে অনেকেই শুয়ে পড়েছে। থেনডুপকে বড় লামা আজও নিজের কাছে ডেকে নিয়েছেন। কিন্তু থেনডুপের আজ ঘুম কিছুতেই আসছে না। যে কথা কোন দিন সে ভাবে নি, আজ সেই ভাবনাতেই সে অস্থির বোধ করছে।

শৈশবের শিক্ষার লোভে সে এই গোম্ফায় এসে ঢুকেছিল। জ্ঞানার্জনই তার কাছে ছিল তপস্যা। কোন স্বার্থের কথা তার মনেই হয় নি। মঠে যত ধনরত্ন আছে, কোথায় লুকনো আছে সে সব, এ কথা তার জানবার ইচ্ছাও হয় নি। মঠের পুঁথির হিসাব সে কণ্ঠস্থ করে ফেলেছে। এক একখানা পুঁথি একবার নয় বার বার পড়েছে, প্রশ্নে প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করেছে বড় লামাকে। পুঁথি ছাড়াও যে অন্য কিছু বড় লামা জানেন, সেদিন শিতেনের কথায় থেনডুপ প্রথম জানল।

থেনডুপ মেনে নিল যে বড় লামা হতে হলে সত্যিই অনেক কিছু জানতে হয়। গোম্ফা ছোট হলে কী হবে, লামার তো অভাব নেই। কত কাজ আছে, কত দায়িত্ব আছে। শুধু বই নিয়ে থাকলেই হয় না, শুধু পড়লেই হয় না। এই যে এতগুলো লামা নানা চক্রান্ত করছে সারাক্ষণ, তাদের সামলানোও সহজ কাজ নয়। কয়েকজনের আচার আচরণ তো লামার মতোই নয়। তারা আকণ্ঠ ছাং গিলে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে, মাত্রা কিছু কম হলে কলহ বিবাদ ও মারামারি করে হুলুস্থূল বাধায়। এক একদিন রাতে তারা গোম্ফাতে ফেরে না. কোথায় কী ভাবে রাত কাটায় তার ঠিকানা নেই। সে এক উচ্ছৃঙ্খল জীবন। থেনডুপ তাদের পুঁথি পড়তে দেখে নি, দেখে নি নির্জনে উপাসনা করতে। সে যখন

ছোট ছিল, তখন তাদের খেতে দেখেছে। গোগ্রাসে তারা খায়। গ্রাম থেকে ছাং আনে, আনে শুকনো মাংস। নিজেদের ঘরে বসে লুকিয়ে সে সব খায়। ছোট ছেলেরা দেখে ফেললে বলে, খবরদার, বলিস নে বড় লামাকে।

থেনডুপের মনে হল, এদেরই একজন হয়তো বড় লামা হবে। তখন তারই হুকুমে চলবে গোম্ফার কাজকর্ম। ছাং আসবে ভারে ভারে, যেমন ছাতু আসে। শুকনো মাংস আসবে। ছ্যাত্তেনরাও হয়তো আসবে। এরা মেয়েদের পড়তে দিতে চায় না, চায় মেয়েদের সঙ্গে গল্প আর হাসি মস্করা করতে। কোন দিন কোন মেয়ে এলে গল্পে গল্পে তাকে আটকে রাখে, কিছুতেই ছেড়ে দিতে চায় না। তারপরে নিজেরাও যায় নিচে নেমে। গ্রামে রাত কাটিয়ে আসে। বড় লামা হয়তো টেরই পান না।

থেনডুপ লক্ষ্য করেছে, রাতের উপাসনার সময় বড় লামা বড় সজাগ থাকেন। চারিদিকে চেয়ে চেয়ে সবাইকে দেখেন। সমস্ত লামা তখন তটস্থ হয়ে থাকেন। এরা গোম্ফা থেকে বেরোয় রাতের উপাসনার পর। অন্ধকার গভীর হলে এদের চাছাং পেম্মা।

কী জীবন! কী করছে তারা! গোম্ফার বাহিরের জীবনের সঙ্গে থেনডুপ তাদের তুলনা করে। কী হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে নিচের মানুষগুলো কিছু শস্য উৎপাদন করে। কিছু ইয়াক আর ভেড়া আছে বলেই তারা কোনমতে প্রাণ ধারণ করে আছে। কিন্তু সেই পরিশ্রমের পুরো ফল তাদের ভোগের অধিকার নেই। ফসলের একটা মোটা অংশ গোম্ফায় দিতে হবে রাজস্ব দেওয়ার মত। আর একটা অংশ দিতে হবে ঙাক-পাকে। তিনি ঝড় ও শিলাবৃষ্টির হাত থেকে মাঠের শস্য রক্ষা করবেন।

থেনডুপ ভাবে, এর পরে ওদের কী রইল! পেটভরা খাদ্য নেই, শিক্ষা নেই এক রতি, জন্মগত সংস্কারে সবাই অন্ধ হয়ে আছে। তা না হলে শিত্তেনরা কী করে ভাবল যে সে তাদের

ভেড়া বানিয়ে দিতে পারে! এমনি করে ভেড়ার মত জীবন-যাপনের জন্যই কি মানুষের জন্ম! বুদ্ধদেবও কি এমনি করে জীবন কাটাতে জন্মেছিলেন!

একদিন একখানা পুঁথির ভিতর সে রথের কথা পড়েছে। বড় লামা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে সে এক অদ্ভুত জিনিস। মানুষ তার উপরে বসে, আর ঘোড়া তা টেনে নিয়ে যায়। কয়েক দিনের পথ এক দিনেই অতিক্রম করা চলে। থেনডুপ জিজ্ঞাসা করেছিল, আমাদের দেশে রথ নেই কেন?

কেউ তৈরি করে না বলে।

আমাদের অত ঘোড়াও তো নেই।

যা আছে, তাও তো কাজে লাগানো চলে।

থেনডুপ সেদিন বলেছিল, আমি রথ তৈরি করব।

এর পরে অনেক দিন কেটে গেছে, কিন্তু রথ তৈরি করবার সুযোগ সে পায় নি। একবার খবর এসেছিল যে তিব্বতের রাজধানী লাসায় রথ চলে। নানা রকমের রথ। সেখানকার জীবনযাত্রা নাকি বদলে গেছে, তাদের আর তিব্বতের মানুষ বলে মনে হয় না। এ সব কথা এখানে কেউ বিশ্বাস করে নি। অসম্ভব আজগুবি কথা কে-ই বা বিশ্বাস করবে!

থেনডুপ ভাবল যে তার জীবনে এবারে নতুন সুযোগ আসছে। ভারতবর্ষটা একবার ঘুরে আসতে পারলেই সে অনেক কিছু দেখে শিখে আসবে। তখন এই গ্রামেও রথ চলবে, বড় লামাকে সেই রথে বসিয়ে ভারতবর্ষটা দেখিয়ে আনতে পারবে।

শুয়ে শুয়ে থেনডুপ উসখুস করছিল। বড় লামা আস্তে আস্তে বললেন, কিরে, ঘুম আসছে না বুঝি?

না।

না কেন! এত অল্পে এমন উতলা হলে কি কোন বড় কাজ করা যায়!

নিঃশব্দে থেনডুপ এ কথা মেনে নিল।

বড় লামা বললেন, ঘুমিয়ে পড়্। নিশ্চিন্তে ঘুমো।

কিন্তু থেনডুপ কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। বড় লামা সব জেনেও যখন নিশ্চিন্ত হতে বলছেন, সে কেন নিশ্চিন্ত হতে পারছে না! বড় লামা যে না জেনে কিছু বলছেন না, তার প্রমাণ সে পেয়ে গেছে। রাতে তাকে নিজের কাছে টেনে নিয়েছেন। দিনের বেলাতেও তাকে আর চোখের আড়াল করতে চাইছেন না। লামাদের দুরভিসন্ধির কথা নিশ্চয়ই তিনি জানতে পেরেছেন। না জানলে এত সতর্ক হবেন কেন!

থেনডুপ এক সময় জিজ্ঞাসা করল, আপনার বুঝি অনেক টাকা আছে?

বড় লামা হঠাৎ জোরে জোরে কথা কইলেন। বললেন, তোকে তো সব দিয়ে দিলাম।

থেনডুপ বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। বলল, কোথায় দিলেন!

প্রাণের ভয়ে এখন অস্বীকার করলে হবে কি! কিন্তু তোর ভয় কিসের! ভেড়া বানানোও তো শিখিয়ে দিয়েছি। মনে মনে সেই মন্তরটা পড়বি, আর যে কাছে আসবে তারই গায়ে মণিচক্রটা ছুঁইয়ে দিবি।

বড় লামা এ কথাগুলোও বললেন জোরে জোরে। আর থেনডুপ আরও আশ্চর্য হল। তিনি দিনের বেলাতেও এমন জোরে কথা কম বলেন। কিছু বুঝতে না পেরে থেনডুপ বিছানার উপরে উঠে বসল।

বড় লামা বললেন, আর ওই মন্তরটা রোজ জপ করবি। দশ লক্ষ জপ পুরো হলেই সকলের সব মতলব ঘরে বসেই জানতে পারবি। তারপর আমি না থাকলেও তোর কোন অসুবিধা হবে না।

বড় লামা আজ এ সব কী বলছেন! থেনতুপ কী বলবে তা ভেবে পেল না।

বড় লামা নিজেও উঠে বসলেন। বললেন, আজ তোকে মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রটা দেব। কেউ তোকে মারবার চেষ্টা করলে সে নিজেই আগে মরবে। আয়, এদিকে আয়।

মন্ত্রচালিতের মত টাশি থেনতুপ বড় লামার কাছে সরে এল। বড় লামা তার হাত ধরে ঘরের একটা কোণায় চলে গেলেন। সামনে বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর ছোট পিতলের মূর্তি। দুজনে সেই মূর্তির সামনে ধ্যানস্থ হয়ে বসলেন।

সহসা চারিদিকে কোলাহল শুরু হয়ে গেল। হৈ-হৈ রৈ-রৈ রব। গোম্ফায় যেন ডাকাত পড়েছে এমনি শব্দ। তারপর ডাকাডাকি শুরু হল। লামারা সবাই বড় লামাকে ডাকছে। জোরে জোরে করাঘাত করছে বন্ধ দরজার উপর।

কিন্তু বড় লামা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। খুব আস্তে আস্তে বললেন, ওদিকে কান দিস নে। আমার সময় প্রায় হয়ে এসেছে। আর বেশি দিন বাঁচব না। তোকে তাই দীক্ষা দিয়ে যাচ্ছি।

থেনতুপের মন বাহিরের কোলাহলের দিকে চলে গিয়েছিল। বুঝতে পেরে বড় লামা বললেন, ও কিছু নয়। ওরা বাধা দেবার চেষ্টা করছে। ঘরের দরজা খুললেই তোকে মেরে ফেলবে।

কেন?

একবার তোকে দীক্ষা দিলে আর তো কেউ বড় লামা হতে পারবে না।

কিন্তু আমি তো বড় লামা হতে চাই নে।

তুই চাস নে বলেই তো তোকে আমি চাইছি। চাইলে অন্য লোক দেখতাম।

থেনতুপকে বড় লামা আর কোন কথা কইতে দিলেন না, অত্যন্ত মৃদুস্বরে বললেন, শোন্ এবার। মন্ত্র তন্ত্র আমার কিছু জানা নেই।

বুদ্ধকে ভালবাসি। তিনিই আমার মন্ত্র, তিনিই আমার বল ভরসা সব। বুকের ভিতর তাঁকে যাতে ধরে রাখতে পারি, সারাদিন আমি সেই চেষ্টা করি।

বড় লামা অনেকক্ষণ তাঁর চোখ বন্ধ করে রইলেন। বাহিরের কোলাহল তাঁকে এতটুকু বিচলিত করল না। তাঁর শান্ত সৌম মুখের দিকে তাকিয়ে থেনতুপের হৃদয় কূলে কূলে ভরে গেল। বড় লামাকে আর মানুষ মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, ওই পিতলের মূর্তিটাই বুঝি হঠাৎ মানুষের রূপ নিয়ে তার পাশে বসে আছেন। কী আশ্চর্য! এত কাছাকাছি থেকেও থেনতুপ এতদিন বড় লামাকে চিনতে পারে নি! এ কথা মনে হতেই থেনতুপ তাঁর পায়ের উপরে লুটিয়ে পড়ল

গভীর স্নেহে বড় লামা তার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। থেনতুপ কি কাঁদছে! তার সবল দেহ যে দুলে দুলে উঠছে!

বাহিরের কোলাহল যে থেমে গিয়েছিল. বড় লামা তা বুঝতে পারলেন থেনতুপের কান্নার শব্দ শুনে। কাঁদতে কাঁদতেই থেনতুপ চেঁচিয়ে উঠল, এমন কঠিন কাজ আপনি কেন আমাকে দিয়ে যাচ্ছেন!

বড় লামা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, আমার দীক্ষা দেওয়া সার্থক হয়েছে।

পিলসুজের প্রদীপে তিনি আরও খানিকটা মাখন তুলে দিলেন।

সকালবেলায় রাতের ঘটনা সবাই ভুলে গেল। তার চেয়েও গরম খবর এসেছে। দিনের আলো ভাল করে ফুটবার আগেই কয়েকজন গ্রামবাসী গোম্ফায় উঠে এসেছে। ভয়ে তারা আড়ষ্ট হয়ে গেছে। মাটির উপরে বসে তারা হাপরের মত হাঁপাচ্ছে।

ওয়াংচুক লামা বয়সে সকলের বড়, বুদ্ধিমানও বেশি। তাদের ধমক দিয়ে বললেন, বল না কী হয়েছে!

ধমক খেয়ে একজন বলে উঠল, আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে।

লাম্‌খো পরা ভারি পায়ের একটা লাথি মারবার জন্য ওয়াঙচুক লামা পা তুলেছিলেন। ভয়ে ভয়ে আর একজন বলে উঠল, চীনারা আসছে।

ওয়াঙচুক লামা বললেন, আসবেই তো। সে আর নতুন কথা কী!

একজন বলল, খালি হাতে তো আসছে না, আসছে অনেক কিছু সঙ্গে নিয়ে। বন্দুকও আছে।

আর একজন বলল, আর আছে লোহার রাক্ষস। উঁচু জমির উপর দিয়ে গোঁ গোঁ করতে করতে চলে।

লোহার রাক্ষসের কথা শুনে লামারাও আশ্চর্য হলেন।

সেই লোকটাই আবার বলল, দু দিকে তার হাজার পা। আর মুখ দিয়ে মাটি তুলছে আর নামাচ্ছে।

নরম সুরে ওয়াঙচুক লামা বললেন, কে দেখেছে এই রাক্ষস?

দেখে নি কেউ।

তবে?

দূরের গ্রামের যারা দেখেছে, তাদের কাছে শুনে এসেছি। দিন কয়েকের মধ্যেই আমাদের গ্রামে এসে পড়বে।

ভয়ে ভয়ে একজন লামা বললেন, সত্যি নাকি!

লোকটি নিজের চোখে কিছু না দেখলেও নিজের কানে সবই শুনে এসেছে। চীনারা নাকি অনেক দিন আগে তাদের দেশে ঢুকেছে। তারা পিপিং থেকে লাসায় এসেছে, এখন শিগাসে হয়ে পুরাং গারথক যাবে। আর এ দিকে ঢুকেছে খাম আর ডাম গিয়াশোয়। ছোটবড় সব জায়গায় ওরা সমান আগ্রহে ঢুকছে।

লামারা সমস্বরে প্রশ্ন করলেন, কী করছে এসে?

প্রথমে নাকি খুব ভালমানুষ সেজে আসছে। বলছে, এবারে তোমাদের আর কোন দুঃখ থাকবে না। প্রথমে তোমাদের পথঘাট

তৈরি করে দেব, এক মাসের পথ তোমরা এক দিনে যাবে। তারপর তোমাদের মাঠেঘাটে সোনা ফলবে। না খেয়ে মরবে না, রোগে মরবে না, লেখাপড়া শিখে তোমরা মানুষ হয়ে যাবে। আরও অনেক আবোল-তাবোল কথা। এ সব কথা কি সত্যি হতে পারে!

লামারা আশ্বাস দিয়ে বললেন, কখ্খনো না।

ওয়াঙচুক লামা জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর?

তারপর সেই সব রাক্ষুসে জিনিস। প্রথমে নাকি কয়েকজন লোক আসে নানা রকমের জিনিসপত্র নিয়ে; হেঁটে আসে না। ইয়াকে বা ঘোড়ায় চড়েও না। ওরা আসে ভেড়ার মত ছোট একটা লোহার জানোয়ারে চেপে। সে জানোয়ারগুলো শব্দ করতে করতে ছোটে। তার পিছনে আসে লোহার বড় বড় রাক্ষস।

দুরন্ত ভয়ে সেই লোকটার দুচোখ যেন ছিটকে বেরিয়ে আসছিল।

অন্য গ্রামবাসীরা ভয়ে ভয়ে বলল, এখন আমাদের উপায় কী হবে?

এক সময় থেনডুপ এসে পিছনে দাঁড়িয়েছিল। উত্তর সেই দিল, বলল, ভয় কিসের! ওরা তো বলছে, ভাল করতেই আসছে।

থেনডুপের কথা শুনে শুধু গ্রামবাসীরা নয়, লামারাও বিস্মিত হলেন। থেনডুপ বলে কী! ও-সব অলক্ষুণে জিনিস এলে কি মানুষের কল্যাণ হয়! ওয়াঙচুক লামা চীৎকার করে উঠলেন, তুমি কি পাগল হয়ে গেছ! এ দেশে ওদের আসতে দিলে কি বুদ্ধ আমাদের ক্ষমা করবেন!

এই আপত্তির কথা শুনে সবাই খানিকটা আশ্বস্ত হয়েছিল। কিন্তু থেনডুপ এগিয়ে এসে বলল, ক্ষতি কী হবে?

ওয়াঙচুক লামা বললেন, কী হবে না!

থেনতুপ বলল, এক মাসের পথ আমরা এক দিনে যাব, মাঠে সোনা ফললে দু বেলা আমরা পেট ভরে খাব, আর রোগে ভুগেও মরব না—

ওয়াঙচুক লামা তাকে কথা শেষ করতে দিলেন না, বললেন, আর বুদ্ধের কোপ যখন পড়বে ?

সমস্বরে সবাই বলল, তখন ?

থেনতুপ বলল, বুদ্ধের কোপ কিসে পড়ে, আর কিসে তাঁর আশীর্বাদ পাওয়া যায়, লেখাপড়া শিখলে সবাই আমরা তা জানতে পারব।

ওয়াঙচুক লামা চেঁচিয়ে উঠলেন, আমরা তা জানতে চাই না।

থেনতুপ থামল না, বলল, বুদ্ধ কোন দিন চান নি যে সবাই মূর্খ হয়ে থাক, রোগে ভুগে অনাহারে মরুক। বরং তিনি এর উল্টোটাই চেয়েছিলেন।

ওয়াঙচুক লামার কণ্ঠস্বর স্বভাবতঃই কর্কশ। এখন তিনি রেগে উঠেছেন। রাগলে তাঁর কাণ্ডজ্ঞানও থাকে না। মনে হয় সে সময় তিনি মানুষ খুন করতে পারেন অবলীলাক্রমে। বললেন, বুদ্ধ কি চেয়েছিলেন আর কি চান নি, তোমার মুখে আমরা তা শুনতে চাই নে।

তবে কি বড় লামার মুখে শুনবেন ?

না।

না কেন! অনেক দিন তো নিরীহ ভালমানুষদের ভুলিয়ে রেখেছেন, এবারে এদের জীবনের আস্বাদ পেতে দিন।

কী!

বলে ওয়াঙচুক লামা থেনতুপের দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। অন্যান্য লামারা তাঁকে ধরে ফেলে বললেন, করছ কী! কাল রাতের ঘটনা কি এরই মধ্যে ভুলে গেলে ?

ওয়াঙচুক লামার পরিবর্তন হল অবিলম্বে। সহসা তিনি সব

উৎসাহ হারিয়ে ঝিমিয়ে পড়লেন। আর কোন কথা কইবারও তাঁর সাহস রইল না।

গ্রামবাসীরাও তাঁর এই পরিবর্তন দেখে আশ্চর্য হল। জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে কাল রাতে ?

কে একজন বলে উঠল, টাশি থেনডুপ এবারে বড় লামা হবে।

গ্রামবাসীরা সকলেই একসঙ্গে চমকে উঠল, থেনডুপ হবে বড় লামা ! এই তো কয়েক বছর আগে সে এতটুকু ছেলে ছিল। মঠে আসবার জন্যে তার কত কান্নাকাটি। সেই ছেলে সবে শক্ত-সমর্থ যুবক হয়েছে। মাথার চুল একটাও পাকে নি, টাকও পড়ে নি মাথায়, আর সব কটা দাঁত এখনও শক্ত আছে। এরই মধ্যে সে বড় লামা হবে! ওয়াঙচুক লামা আছেন, আরও কত প্রবীণ লামা আছেন গোম্ফায়। তাঁরা থাকতে থেনডুপ হবে বড় লামা! বড় লামার এ কী রকম বিচার! তবে কি থেনডুপ লামা সবকিছু জেনে ফেলেছে, হারিয়ে দিয়েছে আর সবাইকে!

থেনডুপ বলল, তোমরা কিছু ভাবনা ক'রো না। ওদের আসতে দাও। আমি এগিয়ে গিয়ে ওদের সঙ্গে বোঝাপড়া করব।

এবারে আর কারও আপত্তি হল না। গড় হয়ে সবাই প্রণাম করল। বলল, তাই কর। আমাদের মঙ্গলের ভার তোমার উপরেই আমরা ছেড়ে দিলাম।

থেনডুপ তাদের সাহস দিয়ে বলল, তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, বুদ্ধ তোমাদের ভালবাসেন।

ফিরে যাবার সময় গ্রামবাসীরা বলল, থেনডুপ লামা যখন বলছে, তখন আর আমাদের ভয় নেই। ওই তো বড় লামা হবে।

•

ওয়াঙচুক লামাকে সবাই টেনে নিয়ে গেলেন। একজন বললেন, এমনি করে ঝিমিয়ে পড়লে তো চলবে না। একটা উপায় ঠাওরাতে হবে।

আর একজন বললেন, তা হবে বৈকি। কিন্তু বড় লামার পক্ষপাতিত্ব আমরা মানব না।

না মেনে আর উপায় কী! মন্ত্র-তন্ত্র সবই তো দিয়ে দিয়েছে!

দিক না। আমরা অন্য গোম্ফায় গিয়ে মন্ত্র-তন্ত্র সব শিখে আসব।

ওয়াঙচুক লামা বললেন, কী বললে?

উত্তর দিলেন ফুরপা লামা, বললেন, ঘরে চলুন, আমি সব ব্যবস্থা করছি।

থেনডুপ বড় লামার সঙ্গে পরামর্শ করল। সত্যিই যদি চীনারা আসে, তাহলে তাদের কী করা উচিত।

বড় লামা সব কিছু শুনলেন, তারপরে বললেন, গ্রামের লোকের ভাল হবে।

আমাদের?

আমাদের কখনও ভাল হতে পারে!

কেন?

আমরাই তো ওদের দুঃখের কারণ। সাদাসিধে সরল লোক ওরা, বোঝে না কিছুই। তাইতেই তো আমরা ওদের পরিশ্রমের মূল্যে এমন সুখে আছি।

থেনডুপ কথা কইল না।

বড় লামা বললেন, আমার দিন তো ফুরিয়ে এল। আজ আছি, কাল নেই। তাই আজ আমার এ কথা বলা উচিত নয়।

একটু থেমে বললেন, আমার এ কথা বলা উচিত ছিল অনেক আগে। তখন প্রাণের মায়ায় বলি নি। আজ আমার প্রাণের ভয় নেই বলেই তোকে সত্যি কথা বলছি। আমরা মরে গেলেই ওদের উপকার হবে।

থেনডুপ ভাবল খানিকক্ষণ, তার পরে বলল, তাহলে আমরা নিজেরা মরে গেলেই তো পারি।

তা পারি, কিন্তু ওদের উন্নতির ভার নেবে কে ?

কেন, আমরা পারি নে ?

তাতে বিপদ আছে। আর এই সিদ্ধান্তই নিতে হবে সকলের আগে। বড় লামা হয়ে আমার মত শান্তির জীবন কাটাবি, না সত্যকে স্বীকার করবি বুদ্ধের মত !

থেনডুপ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, আপনি তো আমার মনের কথা জানেন। বড় লামা হবার লোভ আমার এতটুকু নেই।

তবে সত্যকেই মেনে নে।

এ কথা বলবার সময় বড় লামার বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠল। থেনডুপ চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি দুঃখ পেলেন ?

বড় লামা বললেন, দুঃখ নয়, এ আনন্দের কথা। আমি যা পারি নি আজ সেই কাজ তোকে করতে বলছি। দেশের দুঃস্থ মানুষের জন্যে নিজের জীবনটা তোকে উপহার দিতে হবে।

থেনডুপ কী বুঝল সেই জানে, ঝুঁকে পড়ে বড় লামাকে হঠাৎ প্রণাম করল।

বড় লামা বললেন, পেমকে একবার ডেকে দে।

পেম লামার উপরে বুদ্ধের ভর হয়। যখন কোন গভীর বিষয়ে লামাদের মধ্যে মতের বিরোধ হয়, কিংবা যখন বড় লামা বুদ্ধের সাহায্য চান কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে, পেম লামার তখন ডাক পড়ে। আজও বড় লামা পেম লামাকে ডাকলেন।

পেম লামা আসতেই বড় লামা তাঁকে কাছে ডাকলেন। খুব মৃদুস্বরে তাঁকে কিছু নির্দেশ দিয়ে বিদায় দিলেন।

এবারে ওয়াঙচুক লামা এলেন সদল বলে, ফুরপা লামাকে পাশে নিয়ে। স্মিতহাস্যে বড় লামা বললেন, এস।

ওয়াঙচুক লামা কোন ভূমিকা করে সময় নষ্ট করলেন না, বললেন, আপনার কাছে একটা রায় নিতে আমরা এসেছি।

বড় লামা সবাইকে বসতে বললেন, আর নিজের সামনে কাঠের স্ট্যাণ্ডের উপর যে বইখানা ছিল, সেখানা সরিয়ে রাখলেন।

ওয়াঙচুক লামা উত্তেজিতভাবে মামলার বিষয় নিবেদন করলেন। চীনারা আসছে। তাদের আসতে দিলে গ্রামের প্রভূত ক্ষতি হবে। তাদের এদিকে আসা বন্ধ করা দরকার।

কোন রায় দেবার আগে বড় লামা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরও অনেক কথা জেনে নিলেন। তার পরে গম্ভীর ভাবে বললেন, খুবই চিন্তার বিষয়।

সমবেত সকলেই বড় খুশী হলেন। এই জন্যেই তো বলে বড় লামা, চিন্তার বিষয়কে থেনডুপের মত খেলার জিনিস ভাবেন না। কতকটা আশ্বস্ত মনে ওয়াঙচুক লামা বললেন, তবে উপায়?

বড় লামা তাঁর দু চোখ বন্ধ করে রইলেন অনেকক্ষণ। অন্যমনস্ক ভাবে মণিচক্র ঘোরালেন; বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়লেন। তারপর বললেন, পেমকে ডাক।

লামাদের উল্লাস আর ধরে না। এবারে বুদ্ধের বিচার পাওয়া যাবে। যিনি যেদিকে পারলেন, ছুটে বেরিয়ে গেলেন। বাদ্যযন্ত্র আসবে, পেম লামা আসবেন সেজেগুজে। উপাসনার ঘর আজ লামায় ভরে যাবে সকাল বেলাতেই।

সবাই চলে যাবার পরেও থেনডুপ গেল না। সে ভারি বিমর্ষ হয়েছে। এক মুহূর্তেই বড় লামার মত বদলে গেল।

তার মুখ দেখে বড় লামা হাসলেন, বললেন, পাগল ছেলে!

পাগল আমি, না আপনি!

অভিমানে থেনডুপের বুক থমথমে হল।

বড় লামা উত্তর না দিয়ে শুধু হাসলেন।

উপাসনার ঘরে লামারা একত্র হতে শুরু করলেন। এ বড় জরুরি ব্যাপার। দেরি করলে হয়তো পরে আফসোস করতে হবে। লামারা আজ খুব তাড়াতাড়ি সেজেগুজে চলে এলেন।

আজ তাঁরা সারিবদ্ধ হয়ে বসলেন না, আজ বসলেন চক্রাকারে। কাড়ানাকাড়া করতাল নিয়ে বসলেন কয়েকজন। একজনের হাতে ডামনিয়ে। পেম লামাকে আজ চেনাই যাচ্ছে না। ঝকমকে সাটিনের ছুব্বা পরেছেন। মাথায় টুপি, লম্বা বেণী ঝুলছে। সবাই সাগ্রহে বড় লামার অপেক্ষা করছেন।

মুখ কালো করে থেনডুপ বসেছে পিছনের দিকে। আজ তার বড় অপমান বোধ হচ্ছে। গ্রামের লোকের কাছে তার আর মুখ রইল না। বড় লামা ইচ্ছে করলেই তাকে সমর্থন করতে পারতেন। তারপর আর কারও কিছু বলবার থাকত না। থেনডুপের মনে হল যে বড় লামা তাকে অপমান করবেন বলেই এই কাজ করলেন। তবে কি বড় লামা কাল রাতে তার সঙ্গে রসিকতা করেছেন!

শিতেন তার পাশেই বসেছিল। বলল, আজ তোমার এমন গোমরা মুখ কেন?

পাশে থেকে কে একজন বলে উঠল, বড় লামাগিরি ফলাতে চেয়েছিলেন!

থেনডুপের মুখ আরও গম্ভীর হল।

ভরসা দিয়ে শিতেন বলল, তুমি তো আর হেরে যাও নি, দেখাই যাক না কী হয়।

থেনডুপ সত্যিই খানিকটা ভরসা পেল। হেরে সে এখনও যায় নি। যে জয় তার নিশ্চিত ছিল, বড় লামা তাকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছেন। তার পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বলেই এখন তার অভিমান হচ্ছে বড় লামার উপর।

ঠিক এই সময়ে এলেন বড় লামা, আজ ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে তাঁকে। ভারি সৌম মুখ, নিশ্চিন্ত প্রশান্ত। থেনডুপ এই মূর্তি দেখে আরও আশ্চর্য হল। এ তো বিচার নয়, এ হল ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ। সত্য আজ সম্মান পাচ্ছে না, মর্যাদা পাচ্ছে সংস্কার। বড় লামা শুধু মুখেই সত্যকে ভালবাসার কথা বলেছিলেন।

সবাই উঠে দাঁড়িয়েছিল। বড় লামা নিজের আসনে বসে সবাইকে ভাল করে দেখলেন। থেনডুপকেও দেখলেন মনে হল। তাঁর মুখে যেন থেনডুপ কৌতুক দেখতে পেল। এ কী পরিহাস তাঁর এতগুলো লামার কাছে তাকে এমন ছোট করে দেবার কী প্রয়োজন ছিল! এর চেয়ে দু ঘা মারলেও তার অপমান মনে হত না।

শিতেন বলল, আজ ভারি মজা হবে। তুমি এক দিকে, আর সবাই আর এক দিকে। এবারে বুদ্ধ কার দিকে দেখা যাক।

বড় লামা খানিকক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন। তারপর পেম লামাকে কাজ আরম্ভ করবার আদেশ দিলেন।

কড়-কড় ডুম-ডুম করে কাড়ানাকাড়া বেজে উঠল। আর ঝম-ঝম করে করতাল। ডামনিয়ে ককিয়ে উঠল কান্নার মত। পেম লামা দুলে দুলে উঠে দাঁড়ালেন। সভা শুদ্ধ হয়ে গেল। কারও মুখে আর কোন কথা নেই। দম বন্ধ করে সবাই পেম লামাকে দেখতে লাগলেন।

চোখ বুজে পেম লামা খানিকক্ষণ স্থির হয়ে রইলেন। তাঁর ঠোঁট নড়ছে, বিড়বিড় করে কিছু বলছেন কি!

পেম লামাকে দেখে শিতেনরা ভারি আশ্চর্য হয়। অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁর। দিনে দুপুরে যখন তখন বুদ্ধ তাঁর উপরে ভর করেন। শুধু একটি সাজানো সভা, একটুখানি বাজনা, আর আপনভোলা নাচ। ওই যে পেম লামা এবার দুলে উঠেছেন. মাথা দোলাচ্ছেন, এইবারে পা তুলে লাফিয়ে উঠবেন। ওই যে পেম লামা ধীরে ধীরে তাঁর ডান পা-টা তুলছেন। এইবারে বাঁ পা টাও তুলে লাফিয়ে পড়বেন সামনে। তার পরেই ঘুরে ঘুরে নাচবেন। প্রবল উদ্যমে লামারা এবারে বাজনা বাজাচ্ছেন। এখন আর আস্তে বাজালে চলবে না। নাকাড়ার চামড়া কি ফেটে যাবে, না করতালটাই ভেঙে পড়বে খণ্ড খণ্ড হয়ে!

ঝম করে সমস্ত বাজনা এক সঙ্গে থেমে গেল। পেম লামা লাফিয়েছেন; উপবিষ্ট লামারাও লাফিয়ে উঠে জয়ধ্বনি করলেন।

এবারে আস্তে আস্তে বাজনা শুরু হল, পেম লামার নাচের সঙ্গে তাল রেখে রেখে। অনেকক্ষণ ধরে পেম লামা নাচবেন। তারপর ক্লান্ত হয়ে যখন ঢলে পড়বার মত অবস্থা হবে, তখন তাঁর মুখ দিয়ে গোঁ-গোঁ করে আওয়াজ বার হবে। বড় লামা তখন বুঝতে পারবেন যে, বুদ্ধ এবারে কথা কইবেন পেম লামার মুখ দিয়ে। তখন তিনি তাঁকে প্রশ্ন করবেন।

আজও তাই করলেন। পেম লামা যখন টলছেন, তখন বড় লামা বললেন, কারা আসছে ?

পেম লামার গলায় তখন গোঙানি, বললেন, চীনারা।

চারি দিকে তুমুল জয়ধ্বনি উঠল।

বড় লামা চেঁচিয়ে বললেন, আমরা কী করব ?

উত্তর হল, তারা আসবে।

অ্যাঁ! এ কী রকমের আদেশ! ওয়াংচুক লামা তাকালেন ফুরপা লামার দিকে। আর থেনডুপ জড়িয়ে ধরল শিতেনকে।

সভা স্তব্ধ হয়ে গেল। সমস্ত বাজনা থেমে গেল এক সঙ্গে। পেম লামা তাঁর সংজ্ঞা হারিয়ে মেঝের উপর ঢলে পড়েছেন।

প্রসন্ন হাসিতে উজ্জ্বল দেখাল বড় লামার মুখ।

নয়

থেনডুপ লামাকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম : এ সব অলৌকিক ব্যাপারে আপনার বিশ্বাস আছে ?

থেনডুপ লামা বলল : আজ নেই, কিন্তু মিথ্যা বলব না, সেদিন আমার গভীর বিশ্বাস ছিল। আমি সত্যিই ভেবেছিলাম যে চীনাদের সাহায্য করবার জন্য বুদ্ধের আদেশ পাওয়া গেছে।

এখন কী ভাবছেন ?

কোন দেশের কোন মানুষ যেন আমার মত ভুল না করে। মানুষের জীবনে প্রেম বা ধর্মই সব চেয়ে বড় কথা নয়, তার চেয়েও যা বড় তা হল দেশ। বড় দেরিতে আমি সেই কথা বুঝেছি। আগে বুঝলে এই কাহিনী অন্য রকম হত।

থেনডুপ লামার বুক থেকে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস উঠল। আর তার দৃষ্টিতে দেখলাম বেদনার সমুদ্র। হৃদয়ের রক্তক্ষরণ আমি দেখতে পেলাম না।

অনেকক্ষণ নীরব থাকবার পর থেনডুপ বলল : ছুত্যেন আমাকে নামগিয়েল গোম্ফা থেকে বের করে এনেছিল। তার দৃষ্টিতে—না না, যাক তার কথা।

বলেই থেনডুপ থেমে গেল। মনে হল, নিকটে সে কাউকে দেখতে পেয়েছে। পিছনে ফিরে তাকাতেই আমি মায়াকে দেখতে পেলাম।

সহাস্যে সে এগিয়ে এল। বলল : আপনি এখানে! আমরা আপনাকে সর্বত্র খুঁজে বেড়াচ্ছি।

আমি বললাম : কেন, কোন কাজ আছে নাকি ?

মায়া বলল : কোন কাজ নয়, এখান থেকে বোধহয় আমাদের ফিরতে হবে।

কেন ?

কুলি ছাড়া এখানে আর কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। সামনে এমন দুঃসাধ্য চড়াই যে ডাণ্ডি অচল, সবাইকে হেঁটে যেতে হবে। বৌদি এখান থেকে ফিরে যাবেন বলছেন।

আমি বললাম ঃ বেশ তো, আপনারা হেঁটেই এগিয়ে যান, আমি তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

মায়া সকৌতুকে বলল ঃ তাহলে আপনার গল্পের কী হবে!

আমিও হেসে বললাম : এখানেই সবটা শুনে নেব।

মায়া বলল : দাদাকে তাহলে তাই বলি।

বললাম : আর একটা খবর দিও। মধ্য হিমালয়ে এইটেই সব চেয়ে কঠিন চড়াই। ওপরে খেলা। নীল পাণির পুল ভেঙে গিয়ে থাকলে পাঁচ মাইল পথ ঘুরে যেতে হবে। সে আরও দুঃসাধ্য ব্যাপার। বেশি বৃষ্টিতেও পুল ভাঙে, আবার গরম বেশি পড়লে বরফ গললেও পুল ভাঙে। কাজেই পুলটা ভাঙা বলেই ধরে নিতে হবে।

মায়া আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল : এ পথে আপনি আগে কখনও গেছেন নাকি ?

বললাম : পথের খবর আমার জানা। আর এই পথ অতিক্রম করবার একটা উপায়ও আমার জানা আছে। মজবুত বাঁশে সতরঞ্চি বা কম্বল বেঁধে ঝোলা তৈরি করতে হবে। তার ভেতরে বসলে কুলিরা টেনে তুলতে পারবে।

মায়া বলল : ঠিক বলেছেন, তপোবনের স্বামীজীরাও এই পরামর্শ দিয়েছেন।

দেবেনই। এই পরামর্শ তাঁরা পঞ্চাশ বছর আগেও দিয়েছেন।

থেনডুপ লামা চলে যাচ্ছিল, আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম : বসুন আপনি। হাতে আমাদের আরও কিছু সময় আছে।

কিন্তু মায়াকে আমি বসতে বললাম না। আমি জানি মায়া

বসলে থেনডুপ আর তার গল্প বলবে না। মায়া আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বলল : চলি তাহলে।

বলে সে ফিরে গেল।

থেনডুপ লামাকে আমি কিছু বলি নি। খানিকক্ষণ নীরবে থাকবার পর সে বলল : একে দেখলেই আমার ছ্যুতেনের কথা মনে পড়ে। ভয় করে। ওরা—না থাক ওদের কথা।

আমি বললাম : থাকবে কেন। আপনি বলুন না ছ্যুতেনের কথা।

থেনডুপ লামা এক মুহূর্ত ভাবল। তারপর বলল : বলব। ছ্যুতেনের কথা না বললে আমার গল্পটাই অসম্পূর্ণ থাকবে। পরের ঘটনা আমি সব ছ্যুতেনের কাছেই শুনেছিলাম।

ছ্যুতেনের বাবার নাম পেমবা। পেমবার বাড়ির সামনে এসে নাকি ফুরপা লামা হাঁক দিয়েছিলেন, পেমবা বাড়ি আছ?

পেমবা বাড়ি ছিল না। ছ্যুতেন এসেছিল বেরিয়ে। আর দুপুরবেলায় ফুরপা লামাকে দেখে আশ্চর্য হয়েছিল। লামারা তো অন্ধকারে বেরুতেই ভালবাসেন। তবু ছ্যুতেন তাঁকে প্রণাম করেছিল, কানে আঙুল দিয়ে জিভ বার করে বসেছিল মাটির উপরে। ফুরপা লামা হাত বাড়িয়ে ছাওয়াং দিয়েছিলেন, প্রণাম করলে আশীর্বাদ করতে হয় বৈকি। তারপর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, পেমবা কোথায়?

সে তো কাজে গেছে।

এই অবেলায় আবার কাজ কী?

ফুরপা লামাকে ছ্যুতেন পছন্দ করে না। তাই কোন উত্তর দিল না।

ছ্যুতেনের এই বিরাগের কারণ ফুরপা লামা জানেন। মেয়েটা থেনডুপকে ভালবাসত, আজও ভালবাসে। তারই জন্যে গোম্ফায় যায় যখন তখন। ফুরপা লামা নাকি সেধে অনেক দিন আলাপ

করতে এসেছেন। ছ্যুতেন আমল দেয় নি। কোন লামাকেই সে আমল দেয় না।

ছ্যুতেন যে সুন্দরী মেয়ে তাতে তো কারও সন্দেহ নেই। অনেক লামারই তার উপরে নজর আছে। শুধু নজর কেন, লোভও আছে। আড়ালে আবডালে সে কথা প্রকাশ করতেও নাকি দু একজন বাকি রাখেন নি। কিছু তাঁরা বুঝিয়েছেন। লামারা তো সাধারণ মানুষ নন, শাক্যমুনির অংশে তাঁদের জন্ম। লামার সংসর্গে এসে যদি সন্তান হয় তো তাকে বুদ্ধেরই নবজন্ম ভাবতে হবে। এ সব কথা শুনে ছ্যুতেনের ঘেন্না ধরেছে। সন্তানের কথা এখন সে ভাবে না, সে ভাবে প্রেমের কথা। মনের মতো একটা মানুষ পেলেই তার এখন চলবে। এই গ্রামে তার পছন্দমতো একটা লোকও নেই। আশেপাশের গ্রামেও বুঝি নেই। যে আছে, সে এই নামগিয়েল গোম্ফার ভিতরে, কিন্তু লোকটা একেবারেই নির্বোধ। কোন লোভ নেই, লাভের কথা বোঝে না। প্রেম সম্বন্ধে কোন ধারণা তার এখনও হয় নি। মন কেমন করলে ছ্যুতেন তার কাছে ছুটে যায়, যতটুকু কাছে পায় ততটুকুই লাভ বলে মনে করে।

তার এই দুর্বলতার কথা লামারাও টের পেয়ে গেছেন। তাতে অনেকেরই কিছু আসে যায় না। কিন্তু কয়েকজনের উৎসাহ দেখে ছ্যুতেন আজকাল আশ্চর্য হয়েছে। গায়ে পড়ে নানা রকম পরামর্শ দিচ্ছেন তাকে। ওয়াঙচুক লামা বেশ প্রবীণ হয়েছেন। তিনি বলেন, ও রকম করে হবে নারে, হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যেতে হবে। এই ফুরপা লামাও তাকে উপদেশ দিতে এগিয়ে আসেন। বলেন, খাতির কিসের। বাড়ি নিয়ে গিয়ে তাকে বেঁধে রাখবি।

ছ্যুতেন ভাবে, বাঁধা আর সকলকে যায়, কিন্তু যাকে তার দরকার তাকে যায় না। দড়ি দিয়ে দেহটা বেঁধে লাভ কী, মনটাই যদি না বাঁধতে পারল!

ফুরপা লামা দাওয়ার উপরে উঠে বসে ছ্যুতেনকে বলেছিলেন,

পেমবা বাড়ি নেই তাতে ক্ষতি নেই, খবরটা তোকেই দিয়ে যাই। থেনডুপের জন্যে তুই তো মরতিস।

ছ্যুতেনের ভয় করেছিল খুব। ফুরপা লামা আবার কী সংবাদ এনেছেন! থেনডুপের কোন বিপদ হয় নি তো! গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে ছ্যুতেন লামার মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

ফুরপা লামা বলেছিলেন, বড় লামা বলছেন থেনডুপকে তিনি তাঁর নিজের তখ্‌তে বসাবেন। থেনডুপ বড় লামা হবে।

বিস্ময়ে ও আনন্দে ছ্যুতেনের রোমাঞ্চ হয়েছিল।

তাতে তোর কী লাভ হবে হতভাগী! তোর তো সব আশা নির্মূল হবে।

সত্যিই তো, বড় লামা হলে থেনডুপের আর নাগাল পাওয়া যাবে না। সে কেন পুলকিত হচ্ছে!

ফুরপা লামা বললেন, থেনডুপের আঙুল ফুলে একেবারে কলাগাছ, ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। কী বলছে জানিস?

না তো।

বলছে, চীনাদের সঙ্গে যোগ দেবে।

ছ্যুতেন এ কথার মানে বুঝল না। ফুরপা লামা বললেন, চীনাদের কথা শুনিস নি বুঝি! চীনারা আসছে, সঙ্গে বড় বড় লোহার রাক্ষস। তোদের এই বাড়ির উপর দিয়ে ওরা যাবে, ক্ষেতখামারের উপর দিয়ে। সব ভেঙেচুরে মাঠ করে দিয়ে যাবে। তোদের আর কিছু থাকবে না।

ইয়াক আর লুগুলোও নিয়ে যাবে?

ফুরপা লামা বিব্রত বোধ করলেন। এ কথা তো জেনে নেওয়া হয় নি। নিয়ে যাবে না বললে বোধহয় খবরটা জ'লো শোনাবে, তাই বললেন, কিছু কি আর রাখবে!

তবে থেনডুপ কেন শত্রুদের সঙ্গে যোগ দেবে?

সে কথা তাকেই জিজ্ঞেস করিস।

ছ্যাতেনের বিশ্বাস হল না যে থেনডুপ এমন গর্হিত কাজ করতে পারে। ভাবল যে ফুরপা লামাও সব কথা খুলে বললেন না। থেনডুপকে নিশ্চয়ই এঁরা এখন হিংসে করছেন। এঁরা সব কতদিনের পুরনো লামা। এঁদের বাদ দিয়ে বড় লামা থেনডুপের হাতেই গোম্ফার ভার দেবেন! আশ্চর্য! থেনডুপ নিশ্চয়ই ভাল পড়াশুনা করেছে। শাক্যমুনির সব কথাই হয়তো শিখে ফেলেছে। প্রচুর কৌতূহল নিয়ে ছ্যাতেন জিজ্ঞেস করল, মন্তরতন্তর সব ও শিখে ফেলেছে তাই না!

ফুরপা লামা একটা অবজ্ঞার হাসি হাসলেন।

ছ্যাতেন বলল, বড় লামা তো মানুষকে ভেড়া বানাতে জানে, থেনডুপও নিশ্চয়ই শিখেছে।

ফুরপা লামা বললেন, শিখলেই হল আর কি!

ছ্যাতেন বলল, ঠিক আছে, আপনার ওপরেই পরীক্ষা করতে বলব।

ফুরপা লামা তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন. বললেন, আমার সঙ্গে ঠাট্টা হচ্ছে!

নির্লিপ্ত ভাবে ছ্যাতেন বলল. ঠাট্টা কিসের! ঠিকমতো শিখেছে কি না, সেটা তো একবার পরীক্ষা করে রাখা দরকার।

তা পরীক্ষা করার আর কি লোক নেই যে আমার নাম করবি তার কাছে!

আর কার নাম করব বলুন।

তোর নিজের নাম কর্।

ছ্যাতেন হেসে বলল, আমাকে বুঝি এতই বোকা পেয়েছেন!

ফুরপা লামা চেঁচিয়ে উঠলেন, বললেন. গোম্ফার ভিতর কি আর কোন লামা নেই!

আপনার মতো আর কে আছেন!

ফুরপা লামা কাতর হলেন, বললেন. লক্ষ্মী ছ্যাতেন, তুই খুব ভাল

মেয়ে। বলতে হয়, তুই ওয়াঙচুক লামার নামই করিস। সেই তো থেনডুপের সব চেয়ে বড় শত্রু।

ছ্যুতেন বলল, তাই নাকি!

ফুরপা লামা এবারে ছ্যুতেনের কাছে ঘনিয়ে এলেন, বললেন, বুঝলি ছ্যুতেন, থেনডুপের বুকে মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র না থাকলে কাল রাতেই ওকে মেরে ফেলত। এখন খুব মুশকিলে পড়ে গেছে। এখন মারতে গেলে নিজেই সে আগে মরবে।

কী করবে তাহলে?

সেই জন্যেই তো ভয় পাচ্ছে, আর আমাকে ধরেছে সাহায্যের জন্যে। আমার কী লাভ বল্। আমার কাছে ওয়াঙচুক লামাও যা, থেনডুপ লামাও তাই। আমাকে তো আর বড় লামা কেউ করবে না, থেনডুপের পিছনে লেগে আমি কেন ভেড়া হতে যাই বল্!

কিন্তু আপনি বাঁচবেন কী করে?

কেন, আমি তো তোকে সব কথাই বলে দিলাম। ও ভাবছে তোকে দিয়ে যদি কিছু করতে পারে। তুই যদি ফুসলে ফাসলে থেনডুপকে বার করে আনতে পারিস, অনেক দিন থেকেই সেই চেষ্টা করছে।

বুঝেছি।

বুঝেছিস তো! এবারে একটু ছাং খাওয়াবি?

ছ্যুতেন হেসে বলল, আনছি।

স্মিতমুখে ফুরপা লামা দাওয়ার উপরে আবার চেপে বসলেন।

ছ্যুতেন একচোঙা মদ আনল। চোঙাটি হাতে নিয়ে বললেন, শুধু মদ! এক টুকরো শুকনো মাংস দিবি নে?

হাসতে হাসতে ছ্যুতেন মাংসও নিয়ে এল।

মদ আর মাংস হাতে নিয়ে ফুরপা লামার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। বললেন, বুঝলি ছ্যুতেন, এইসব খাইয়েই ওয়াঙচুক লামা

আমাকে বশ করেছে। যখন যা চায়, তাই করিয়ে নিচ্ছে আমাকে দিয়ে।

চোঙায় মুখ দিয়ে কয়েক চুমুক মদ খেয়ে বললেন, থেনডুপ লামাও লোক মন্দ নয়, কিন্তু আমাকে বশ করার কায়দা জানে না।

ছ্যুতেন বলল, আমি তো জানি।

এ কথার উত্তরে ফুরপা লামা হেঁ হেঁ করে হাসলেন।

ফুরপা লামা চলে যেতেই ছ্যুতেন গোম্ফার দিকে ছুটেছিল। থেনডুপের সঙ্গে তার একটা বোঝাপড়া করা দরকার। চীনাদের সঙ্গে যোগ দিলে ক্ষতি নেই, কিন্তু বড় লামা হলেই বিপদ। ওর আশা তাহলে জন্মের মতোই ছাড়তে হবে। কিন্তু থেনডুপের আশা ছ্যুতেন এত সহজে ছেড়ে দিতে পারবে না।

ফুরপা লামা গোম্ফায় ফেরেন নি, পাশের বাড়িতে গিয়ে ঢুকেছিলেন। ছ্যুতেনকে ছুটতে দেখে হেঁকে বললেন, কোথায় যাচ্ছিস?

না থেমেই ছ্যুতেন বলল, আপনাদের গোম্ফায়।

ফুরপা লামা বললেন, আমার কথা যেন থেনডুপকে বলিস না।

ছ্যুতেন কোন উত্তর দিল না।

নিচে থেকে নামগিয়েল গোম্ফাটা ভারি সুন্দর দেখায়। কিন্তু ছ্যুতেনের কাছে আজ ওটা জেলখানার মতো মনে হল। থেনডুপ ঐ জেলখানায় বন্দী হয়ে থাকবে সারা জীবন। না না, ছ্যুতেন কিছুতেই তা হতে দেবে না। থেনডুপের হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে আসবে, তারই সঙ্গে ঘর বাঁধবে মনের আনন্দে। কত লোকেই তো লেখাপড়া শেষ করে সংসারী হয়, কত লামাও সংসারী হয়েছে। থেনডুপ কি ছ্যুতেনের ডাকে সাড়া দেবে না কিছুতেই!

রুক্ষ পাথরের পথ ধরে ছ্যুতেন আজ ছুটছে। বন্ধুর অসমতল পথ এঁকেবেঁকে উপরে উঠেছে। মানুষ থেমে থেমে ওঠে। কিন্তু

ছ্যাতেন থামল না। দম তার ফুরিয়ে গেছে। তবু উঠল হাঁপাতে হাঁপাতে।

বাহিরের রোদে বসে শিতেন ঘুঁটি চালছিল। একা একা আপন মনেই কিছু খেলছিল। ছ্যাতেনকে দেখে লাফিয়ে উঠল, বলল, সব খবর শুনেছ তো?

ছ্যাতেন হাঁপাচ্ছিল, উত্তর দিতে পারল না।

শিতেন গড়গড় করে বলল, থেনতুপ বড় লামা হবে, আর চীনাদের সঙ্গে বন্ধুতা করবে।

কোথায় থেনতুপ?

ঘরে বসে লেখাপড়া করছে।

ছ্যাতেন আর অপেক্ষা করতে রাজী নয়, বলল, তাকে ডেকে দাও না একবারটি।

তার কথা শেষ হবার আগেই শিতেন হাত-পা ছুঁড়ে দৌড়ে ভিতরে গেল।

ছ্যাতেন আজ বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে, অধৈর্য অপেক্ষা। কিন্তু থেনতুপ আসছে না। শেষ পর্যন্ত শিতেন একাই ফিরে এল। তাকে একা ফিরতে দেখে ছ্যাতেন চেঁচিয়ে উঠল, থেনতুপ কোথায়?

ও আসবে না।

কেন?

তোমার সঙ্গে ও আর দেখা করবে না।

করবে না বললেই হল!

বলে ছ্যাতেন নিজেই ভিতরে ছুটে গেল।

পিছন থেকে শিতেন চেঁচিয়ে উঠল, যেও না, যেও না বলছি।

কিন্তু ছ্যাতেন আজ কোন বাধা মানবে না, বাধা মানতে গেলে জীবনটা যে তার ব্যর্থ হয়ে যাবে। এত দিন সে সব কিছু মেনেছে, নীরবে অপেক্ষা করেছে তার পরম ক্ষণের জন্যে। এই অপেক্ষায় তার

কী লাভ হল, কী পেল সে! নিজের হৃৎপিণ্ডটা নিয়ে কেউ পালিয়ে যাবে, আর ছ্যুতেন কি মজা দেখবে চুপ করে দাঁড়িয়ে!

শিতেন তাকে অনুসরণ করে খানিকটা এগিয়েছিল। কাঠের অন্ধকার বারান্দা বড় সংকীর্ণ। সামলে না চললে সামনের মানুষের সঙ্গে ধাক্কা লাগবে। শিতেন সন্তর্পণে এগোচ্ছিল, তবু ধাক্কা খেল। প্রথমটায় সে হকচকিয়ে গিয়েছিল। দেওয়ালের সঙ্গে মাথা ঠুকে আঘাতও পেয়েছিল অল্প। তারপরে দূরে দাঁড়িয়ে দেখল থেনতুপকে ছ্যুতেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে। থেনতুপের একটা হাত সে চেপে ধরেছে, আর থেনতুপ কিছুতেই সেই হাত ছাড়াতে পারছে না।

থেনতুপ দেখল যে শিতেন হতবুদ্ধি হয়ে তাদের দেখছে। কী করবে ভেবে না পেয়ে নিজের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বাহিরে বেরিয়ে গেল।

থেনতুপকে নিয়ে ছ্যুতেন গ্রামের দিকে গেল না, তাকে টেনে নিয়ে গেল পাহাড়ের উল্টো দিকে। সেদিকে কোন পথ নেই, ঝোপঝাড় কাঁটাগাছে সে ধারটা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। খানিকটা নিচে নেমে একটু পরিচ্ছন্ন জায়গায় দুজনে পাশাপাশি বসল। ছ্যুতেন তখন হাঁপাচ্ছিল, হাপরের মতো ওঠানামা করছিল তার বুক।

বিস্ময়ের ঘোর থেনতুপের তখনও কাটে নি। এই মেয়েটা কি আজ পাগল হয়ে গেল! পাগল না হলে এমন অভাবনীয় আচরণ কেন করবে! কিন্তু তার পাগল হবার মত কিছু হয় নি তো! কিন্তু ছ্যুতেন এখন কথা বলতে পারবে না। থেনতুপ বুঝতে পারছে যে এখন তার মুখের দিকে চেয়ে শুধু অপেক্ষাই করতে হবে।

থেনতুপের সহসা তার মাকে মনে পড়ল। তার মা এই রকম সুন্দরী ছিলেন। এমনি ফর্সা, এমনি কোমল নরম শরীর। ছ্যুতেনের শক্তি আছে, কিন্তু হাত বড় নরম। ছ্যুতেন খুব শক্ত করে তার হাত ধরেছিল। চেষ্টা করলে সে তার হাত ছাড়িয়ে নিতে পারত, কিন্তু কেন যেন সে রকম চেষ্টা করতে তার ইচ্ছা হয় নি। থেনতুপ

তার নিজের হাতের দিকে চেয়ে দেখল। না, কোন দাগ পড়ে নি। কিন্তু ছ্যুতেনের হাতের উত্তাপ বুঝি লেগে আছে। এই সুন্দর মেয়েটার দেহে এত উত্তাপ আছে!

তারপরে সে তার মনের উত্তাপের খবরও পেল। ছ্যুতেন অকপটে বলল সব কথা। ফুরপা লামার কথা থেকে আরম্ভ করে তার নিজের কথা পর্যন্ত। গভীর বিস্ময়ে থেনতুপ ছ্যুতেনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ছ্যুতেন এবারে বুঝি লজ্জা পেল, বলল, অমন করে কী দেখছ?

থেনতুপ বলতে পারত, তোমাকে। কিন্তু এই সত্য কথাটা তার মুখে আটকে গেল। বলল, কিছু না।

ছ্যুতেন বলল, মিথ্যে কথা।

আর থেনতুপ কোন প্রতিবাদ করতে পারল না।

ছ্যুতেন বলল, আমি জানি, তুমি একদিন আমার দিকে তাকাবেই। আর সেই জন্যেই আজও আমি তোমার অপেক্ষা করে আছি।

তারপর নিজের হাত রাখল থেনতুপের কোলে। থেনতুপ চমকে উঠল, কিন্তু হাত দিয়ে সেই সুন্দর হাতখানা সরিয়ে দিতে পারল না।

ছ্যুতেন হেসে বলল, ভয় পেলে নাকি?

থেনতুপ সত্যিই খানিকটা ভয় পেয়েছিল। কিন্তু সে কথা স্বীকার করল না। বলল, ভয় পাব কেন?

পেয়েছই তো, না হলে চমকে উঠবে কেন?

থেনতুপের মনে হল যে, ছ্যুতেনের নরম হাতখানার উপরে অনায়াসেই নিজের একটা হাত রাখা চলে। কিন্তু কী ভাববে ছ্যুত্যেন। অন্যেই বা দেখতে পেলে কী ভাববে!

থেনতুপের কোন উত্তর না পেয়েও ছ্যুতেন বলল, আমার দিকে কি তুমি কোন দিন চেয়ে দেখেছ, না এখনও চাইছ ভাল করে!

তোমার নজর যে অনেক উঁচু তা আমি জানি। তুমি বড় লামা হবে, এই গোম্ফার সমস্ত লামা তোমার কথায় উঠবে আর বসবে। ছ্যুতেনকে তোমার পছন্দ হবে কেন! ছ্যুতেন তো তোমাকে স্বর্গের সিঁড়িতে চড়াবে না!

অভিমানে ছ্যুতেন সহসা ভেঙে পড়ল। আর থেনডুপ কী বলবে ভেবে পেল না।

ছ্যুতেন থামল না, মাথাটা নুইয়ে বলল, আমার মাথাটা একবার দেখ। একমাথা রুক্ষ চুল, আজও আঁচড়াই নি ভাল করে, মুখ ধুই নি, গা ঘষি নি। আমার সমস্ত সৌভাগ্য আজও আমি আঁকড়ে ধরে আছি। এ সব কার জন্যে তা কি বোঝ না?

থেনডুপ আশ্চর্য হল তার কথা শুনে। মেয়েটার মাথা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল নাকি! এই তো একটু আগে বেশ কথা বলছিল তার সঙ্গে! সে কিছু বলবার আগেই ছ্যুতেন তার মাথাটা থেনডুপের কোলের ভিতর গুঁজে দিয়ে গভীর কান্নায় ভেঙে পড়ল।

থেনডুপের বড় অসহায় বোধ হল। ব্যস্ত ভাবে তার পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, মেয়েটা পাগল হয়ে গেল নাকি!

পাগল আমি হয়েছি, না তুমি আমাকে পাগল করেছ?

বলেই মুখ তুলে ছ্যুতেন থেনডুপের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর হাত দুটো মুঠো করে থেনডুপের বুকে পিঠে কিল মারতে লাগল নির্দয় ভাবে।

এখন কিছু বুঝবে কেন, এখন তো ন্যাকা সাজবেই।

বলে সে আরও মরিয়া হয়ে উঠল।

ভয় পেয়ে থেনডুপ তাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরল। শক্ত করেই ধরল। ছ্যুতেনের হাত তার পিঠে পৌঁছল না, শূন্যেই তার হাতের আস্ফালন নিঃশেষ হয়ে গেল। ছ্যুতেন দু হাতে থেনডুপের গলা জড়িয়ে তার বুকের উপর মুখ ঘষতে লাগল।

থেনডুপ আজ এমন অস্থির বোধ করছে কেন! তার দু কান

গরম হয়ে উঠেছে, নিঃশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। আজ কি গরম খুব বেশি! তা কেন হবে! আকাশে তো সূর্য নেই, দিনের আলোও আর তেমন তীব্র নয়। অন্ধকার নামবে একটু পরেই। তবে কি ছ্যাতেনের গা এমন গরম!

ছ্যাতেন কথা কইল আস্তে আস্তে, বলল, কথা দাও এইবারে।

থেনতুপ তার হাত একটু আলগা করে বলল, কী কথা?

ছ্যাতেন এবারে হেসে বলল. এমন ন্যাকা সাজতেও পার!

কিন্তু থেনতুপ সত্যিই তার কথা বোঝে নি, আর ছ্যাতেন আঘাত পেল এই কথা বুঝতে পেরে। কিন্তু আজ তার আঘাত পেয়ে চুপ করে থাকলে চলবে না, আজ তাকে কথা আদায় করতেই হবে। এমন করে আর কি থেনতুপকে পাওয়া যাবে! থেনতুপের গলা ছ্যাতেন আরও জোরে জড়িয়ে ধরল, বলল, আমাকে তুমি বিয়ে কর।

বিয়ে!

থেনতুপের সামনে যেন বজ্রপাত হল।

কিন্তু ছ্যাতেনের আলিঙ্গন এতটুকু শিথিল হল না। মুখ তুলে বলল, কথা তোমাকে আজ দিতেই হবে।

এমন দিন বুঝি আর আসবে না। এমন সুযোগ। এই উদাসীন সন্ন্যাসীটাকে তো এমন করে কোন দিন পাওয়া যায় না। আজকেই তাকে বেঁধে ফেলতে হবে, তার কথার বাঁধনে, তার সত্যের বন্ধনে। অসহিষ্ণু ভাবে ছ্যাতেন বলল, কই, উত্তর দিচ্ছ না যে!

থেনতুপ বলল, তুমি এমন কথা বলছ যে তার কোন উত্তর নেই।

ছ্যাতেন বলল, উত্তর নিশ্চয়ই আছে। গোম্ফায় থেকে তুমি সে উত্তর ভুলে গেছ। এস, আমি তোমায় আবার মনে করিয়ে দিই।

বলে তার গলা ছেড়ে দিয়ে গা ঘেঁষে বসল। থেনতুপের একখানা

হাত নিজের কোলের উপরে টেনে নিয়ে বলল, আমাদের বাড়িটা তোমার মনে আছে? তুমি তো যাও ওদিকে, কিন্তু তাকাও না একবারও। তাকালে দেখতে পেতে, আমাদের নতুন একখানা ঘর হয়েছে, সেইটে আমার। আমরা দুজনে ঐ ঘরে থাকব।

সেই সঙ্গেই সে আশ্বাস দিল, চাষ আবাদ তোমাকে কিছু করতে হবে না। আমাদের একটা চাকর এসেছে. টং ডু চাকর। আমার ঠাকুর্দার কাছে ওর ঠাকুর্দা ধার নিয়েছিল। এত দিনেও শোধ দিতে না পেরে জন খাটতে এসেছে। একবার যখন এসেছে তখন কি আর ছাড়া পাবে! কিছুই তো ওর নেই। আমাদের কাজ করে তবু এখন দুটো খেতে পাচ্ছে।

তারপরে গর্বিত ভাবে বলল, আমাদের এখন কটা ইয়াক জান? আর কতগুলো লু? উঁহু, আজ কিছুতেই বলব না। আমাদের বাড়ি চল, নিজের চোখেই সব দেখে আসবে।

থেনডুপ কিছু বলবার অবকাশ পাচ্ছিল না. তার চেষ্টাও করে নি। ছ্যুতেন আবার বলল, তোমার তীর্থের শখ নেই? সেই মানসের তীর্থ, মানস সরোবর! সেখানে তো শুনেছি বুদ্ধের দেখা মেলে!

থেনডুপ বলল, তোমরা যাচ্ছ বুঝি?

আমাদের এক আত্মীয় দণ্ড খাটতে যাবে। চল না, আমরাও ঘুরে আসি। একটা খুর নেব, তাঁবু। আর এক জোড়া খি, কুকুর। আর খাবার জিনিসপত্র। কয়েকটা মাস আমাদের ভারি আনন্দে কাটবে।

ছ্যুতেন বলে চলল, তুমি তো ছাং খাও না, নাই বা খেলে। আমি খুব ভাল স্যেজা তৈরি করি। আমার হাতের চা একবার খেলে কেউ আর মদ খেতে চায় না। তুমি তো মাংসও খাও না, তারও দরকার নেই। আমি তোমাকে সাজ্জির ঝোল রেঁধে খাওয়াব।

আর একটা কথা বলবার আগে ছ্যুতেনের ফর্সা গাল রাঙা হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি থেমে গিয়ে বলল, না, থাক সে কথা।

ছ্যুতেনের এই লজ্জা থেনতুপের ভাল লাগল, বলল, থাকবে কেন বলেই ফেল।

তুমি হাসবে।

হাসব না।

ঠিক তো!

বলে ছ্যুতেন সলজ্জায় সেই কথা বলল, তুমি তো লামা। আমি শাক্যমুনির নতুন জন্মের কথা ভাবছিলাম। না, তুমি হাসছ।

বলে ছ্যুতেন আবার থেনতুপের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এবারে থেনতুপ আর বিব্রত হল না। দুহাত বাড়িয়ে তাকে টেনে নিল।

আলোর অভাবে চারিদিক অস্পষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু থেনতুপের মনে হল, তার জীবনে বুঝি আজ প্রথম আলো পড়ল। সহসা তার বিশ্বাস হল যে এই মেয়েটা তার শূন্য জীবনকে ভরে দিতে পারবে কূলে কূলে।

দুজনে যখন তারা উপরে উঠে এল, অন্ধকার তখন গভীর হয়েছে। হিমেল হাওয়া বইতে শুরু করেছে হাড় কাঁপানো। কিন্তু এই অন্ধকারের ভিতরেও শিতেন পায়চারি করছিল। তাদের আসতে দেখেই এগিয়ে এল, বলল, সর্বনাশ হয়েছে।

কী সর্বনাশ!

বড় লামাকে ওয়াঙচুক লামা ডেকে এনেছিলেন। তিনি তোমাদের দেখে গেছেন।

থেনতুপ ভয় পেল না, বলল, তাঁদের খবর দিল কে?

শিতেন ভয়ে ভয়ে বলল, বোধহয় ফুরপা লামা।

থেনতুপ আর কোন প্রশ্ন না করে ছ্যুতেনকে বলল, চল, তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি।

গোম্ফা থেকে নেমে যাবার সময় থেনডুপ দেখল, অন্ধকারে যেন সারি সারি চোখ দেখা যাচ্ছে। ছোট ছোট নীল চোখ শেয়ালের মতো, শকুনের মতো, মানুষের মতো নয়। তাকাক তারা, তাকিয়ে থাক। থেনডুপ মানুষের চোখকে ভয় পায়, ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে সেই চোখ। ওদের মধ্যে মানুষের চোখ নিশ্চয়ই নেই।

অনেকটা পথ নেমে আসবার পর ছ্যুতেন বলল, আর কত দূর আমাকে এগিয়ে দেবে?

থেনডুপও এই কথাই ভাবছিল। বড় লামার কাছে সে মুখ দেখাবে কেমন করে! তিনি হয়তো কিছুই বলবেন না, কোন কৈফিয়ৎও চাইবেন না তার কাছে। কিন্তু তাই বলে তো থেনডুপ এমন উচ্ছৃঙ্খল হতে পারে না। বড় লামা তাকে ভালবাসেন, অনেক ভরসা রাখেন তার উপর। তাইতেই তিনি কাল রাতে তাকে সব চেয়ে বড় সত্যটা জানিয়ে দিয়েছেন অসঙ্কোচে। সেই তো সত্যিকারের দীক্ষা। ভেড়া বানানোর মন্ত্র শেখানোকে কি দীক্ষা বলে! থেনডুপ আজ সেই বড় লামাকে হতাশ করেছে। তাঁর অসংযত আচরণে নিশ্চয়ই তিনি আঘাত পেয়েছেন। আঘাত তাঁকে পেতেই হবে। থেনডুপ নিজেই যে এখন অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছে।

কিন্তু কিসের অনুতাপ! কার কাছে সে অপরাধ করেছে! মানুষকে দূরে সরিয়ে দেওয়া কি বুদ্ধের শিক্ষা! কখনই না। মানুষকে বাদ দিয়ে তো ধর্ম নয়। ধর্ম মানুষের জন্যেই, মানুষকে ভালবাসাও ধর্ম। ছ্যুতেনের ভালবাসার মর্যাদা সে দিয়েছে, এতে তার ধর্ম নষ্ট কেন হবে! বুদ্ধের শিক্ষা নিশ্চয়ই অন্য রকম নয়!

কিন্তু—

এই কিন্তুর জবাব থেনডুপ খুঁজে পাচ্ছে না। অন্যায় যদি সে নাই করে থাকে তো দুর্ভাবনা কেন তাকে পেয়ে বসেছে! কেন সে বড় লামার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে এমন সঙ্কোচ বোধ করছে!

থেনহুপের মনে হল যে ন্যায় অন্যায়ের সংজ্ঞা আছে দু রকম। একই কাজ দুজনের কাছে দু রকম মনে হয়। গোম্ফার বাহিরে যাকে জীবনের জয়যাত্রা বলি, গোম্ফার ভিতরে নেই সেই কাজের সমর্থন। পৃথিবীর স্বর্গ বুঝি স্বর্গের স্বর্গ নয়।

থেনহুপের কাছে কোন উত্তর না পেয়ে ছ্যুতেন বলল, গোম্ফায় ফিরবে না আজ?

অন্যমনস্কভাবে থেনহুপ বলল, না।

ছ্যুতেন খুশী হল অপরিমিত। বলল, আজ থেকেই তুমি আমাদের বাড়িতে থাক।

থেনহুপ এ কথার উত্তর দিল না।

অন্ধকারে পথ চলতে তাদের কষ্ট হচ্ছে। একটু অসাবধান হলেই হোঁচট খেতে হচ্ছে পথে। তবু তারা সন্তর্পণে নামছে না, নামছে লাফিয়ে লাফিয়ে। ছ্যুতেন বলল, তুমি কি তোমাদের নিজের বাড়িতে থাকবে?

উত্তর সেই দিল, বলল, কিন্তু সেখানে তোমাকে থাকতে দেবে কেন? তোমার মা নেই, তোমার দামও নেই কোন।

মা!

থেনহুপের মন চলে যায় অনেক বছর পিছিয়ে। তখন তার মা বেঁচেছিলেন। গোম্ফায় যেতে দিতে তাঁর কত আপত্তি ছিল। সে গেছে অনেক জোর করে। কিন্তু মা তাকে ছাড়তে পারেন নি কত ঘন ঘন আসতেন। কত ছিরিল এনে খাওয়াতেন। এই ছ্যুতেন মেয়েটা তো তার মার কাছ থেকেই এ সব শিখেছে তার মাকে দেখেছে থেনহুপের জন্য দুধের বড়ি আনতে। সেও তাই আনে।

পায়ে একটা ঠোকর খেয়ে ছ্যুতেন পড়ে যাচ্ছিল। থেনহুপের একটা হাত জোরে চেপে ধরল। পড়ল না, কিন্তু হাতটাও আর ছেড়ে দিল না। থেনহুপ বুঝতে পারছে যে ছ্যুতেন তার একখানা

হাত দখল করেছে। করুক দখল। দুখানা চেপে ধরলেও এখন তার কোন আপত্তি নেই।

কিন্তু কার কাছে সে যাবে? আজ রাতের মত আশ্রয় চাইবে কার কাছে! ছ্যুতেন ঠিকই বলেছে, নিজের বাড়িতে তার মা নেই, কোন দামও তার নেই। যারা আছে, তারা তাকে হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করবে না। ছ্যুতেনের মত বলবে না, এস।

কাল প্রভাতে আর কোন ভাবনা থাকবে না। তার চোখের সামনে প্রশান্ত পৃথিবী দেবে হাতছানি। উজ্জ্বল আলোকে দীপ্ত উদার আশ্বাসে ভরা পরিচিত পৃথিবী দৃষ্টি তার অন্ধকারে ধাক্কা খেয়ে চিন্তার জট পাকাবে না। আজ রাতের জন্যই তার ভাবনা। তার মা নেই, কিন্তু বাপেরা আছেন। তাঁদের কারও নামে তার বুক ভরে ওঠে না। বুকের উত্তাপ কারও কাছে সে পায় নি। থেনতুপ জানে যে সে বড় লামা হচ্ছে শুনলে আদর করে তাঁরা ঘরে নেবেন, কিন্তু গোম্ফা ছেড়ে চলে আসছে শুনলে হয়তো কথাই কইবেন না। থেনতুপ কি সত্য গোপন করে তাঁদের কাছে আশ্রয় নেবে! না না, সে তা পারবে না। তার চেয়ে ঠাণ্ডা মাটির উপর শুয়ে সে রাত কাটিয়ে দেবে।

ছ্যুতেন বলল, কী ভাবছ বলতো?

ভাবনার কী শেষ আছে!

শুরু একটা আছে

থেনতুপ জানে যে তার ভাবনার কথা তাকে বলতেই হবে। না বললে ছ্যুতেন তাকে ছেড়ে দেবে না। বলল, ভাবছি, এবারে কী করব।

কী আর করবে! আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ি যাবে, থাকবে আমাদের সঙ্গে। এতে আবার ভাবনার কী আছে!

অন্যমনস্ক ভাবে থেনতুপ বলল, সত্যিই তো।

থেনতুপের হাত ছ্যুতেন ছেড়ে দেয় নি। খুশী হয়ে বলল,

তোমাকে যে একদিন আমার কাছে আসতেই হবে, আমি তা জানতাম।

থেনতুপ আজ নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছে। এ কথারও কোন উত্তর দিতে পারল না।

জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যা আকস্মিক কোন কারণ ব্যতিরেকেই তা ঘটে। কিন্তু তারপরে জীবনটাকে তোলপাড় করে দেয়। থেনতুপের মনে হচ্ছিল যে আজ যা ঘটল, সেও একটি তেমনি ঘটনা। কোন কারণ ছিল না, প্রয়োজন ছিল না, মনের কোন বাসনাও জড়িত ছিল না। অথচ ঘটে গেল। আর তার পরে এই জীবনের স্রোত পুরনো ধারায় আর কিছুতেই বইবে না। বইতে পারে না। থেনতুপের আত্মসম্মান বোধ আছে। অন্য লামাদের মত সে তো বেহায়া নয়।

থেনতুপের মনে হল যে গোম্ফা থেকে বেরিয়ে এসে সে ভালই করেছে। অতগুলো শকুনের মাঝখানে আর তাকে ফিরে যেতে হবে না। কিন্তু সে কি ছ্যাতেনের জন্যেই গোম্ফা ছাড়ল! নিশ্চয়ই না। এই মেয়েটা তাকে কোন দিন আকর্ষণ করতে পারে নি, হয়তো কোন দিনই পারবে না। আজ তার একটা অসতর্ক মুহূর্তে যা ঘটেছে, জীবনে তা সত্য হয়ে ওঠা উচিত নয়।

তারপর তার বড় লামার কথা মনে হল। দেবতা তিনি। থেনতুপ কি তাঁকে অপমান করল না! থেনতুপ জানে যে সমস্ত ঘটনা তাঁকে খুলে বললে বড় লামা তাকে ক্ষমা করবেন। ক্ষমা তিনি সকলকেই করেন। কেউ তাঁকে হত্যা করলে তাকেও তিনি ক্ষমা করে যাবেন। থেনতুপের বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠেছিল।

কিন্তু সে যে পথের মাঝেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল, তা সে জানতে পারে নি। ছ্যাতেন দাঁড়ায় নি, তার হাত ধরে টেনে বলল, এখানে নয়, আরও একটু এগিয়ে। সামনে ওই বাড়িটা দেখতে পাচ্ছ না! ওইটেই আমাদের বাড়ি।

অন্ধকারেও অনেক কিছু দেখা যাচ্ছে। ছ্যুতেনদের বাড়িটাও অস্পষ্ট নয়। থেনত্থুপকে সে থামতে দিল না, টেনে টেনেই নিয়ে চলল।

কিন্তু বেশি দূর তাকে টানতে পারল না। তার শক্তির আধার ছিল না অনন্ত। যে শক্তিতে তপস্বীর তপোভঙ্গ হয়, আর সন্ন্যাসী হয় গৃহী, থেনত্থুপের আদর্শের কাছে ছ্যুতেনের সে শক্তি হেরে গেল। ছ্যুতেন তাকে একটি রাতের মত বন্দী করেছিল। কিন্তু প্রভাতের আলোয় আর তাকে দেখতে পেল না। কেউ জাগবার আগেই থেনত্থুপ পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল।

দশ

ধারচুলায় ছাড়াছাড়ি হবার পর থেনতুপ লামার সঙ্গে অনেক দিন আমার দেখা হয় নি। এক সময় মনে হয়েছিল যে, তার সঙ্গে আর বোধহয় আমার দেখা হবে না। পাহাড়ী পথে স্বচ্ছন্দে চলার অভ্যাস তার আছে। আমাদের মতো বুকে হেঁটে সে চলবে না, দেশে ফেরার আনন্দে তরতর করে এগিয়ে যাবে। বোধহয় গেছেও তাই।

তার জীবনের কাহিনী যতটুকু শুনেছি, তা নিয়ে একটা ছোট গল্প হয়। কিন্তু উপন্যাসের উপাদান পেতাম বাকি অংশটা শুনতে পেলে। কুসংস্কারে আচ্ছন্ন একটা জাতির কথা কিছু জেনেছি, জানতে পারি নি এ-যুগের সভ্যতার সঙ্গে তার সংঘর্ষের কথা। চীনারা যে আসছিল সে কথা আমরা খবরের কাগজে পড়েছি। তিব্বতের ভাগ্য-বিধাতা তালে লামা ও পেনছেন লামার কথাও জানি। তালে লামাকে আমরা দলাই লামা বলি, তিনি এখন কাঙড়া উপত্যকার ধর্মশালা শহরের কাছে আছেন। তাঁর সঙ্গে অসংখ্য লামা দেশ ছেড়ে চলে এসেছেন। এঁদের সম্বন্ধে আমার কোন কৌতূহল ছিল না। চীনাদের সঙ্গে তখন আমাদের প্রীতির সম্বন্ধ ছিল বলে তাদের আচরণ নিয়ে আমরা আলোচনা করি নি।

এখন থেনতুপ লামার সঙ্গে পরিচয় হবার পর এই প্রশ্ন আমার প্রথম মনে এল। জানবার বাসনা হল সেই অজ্ঞাত অনাবৃত দেশের কাহিনী। কিন্তু এখন আর তার উপায় নেই। থেনতুপ লামার সঙ্গে দেখা না হলে নতুন কিছু আমার জানা হবে না। অথচ তার সঙ্গে আমার দেখা হবে বলেও মনে হচ্ছে না।

গার্বিয়াঙের দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম। ধারচুলা থেকে গার্বিয়াঙ পাঁচ দিনের পথ। নিজের পায়ের উপরেই একমাত্র ভরসা, আর ভরসা মনোবলের উপর। খেলার চড়াই পার হয়ে পঙ্গুর পাহাড়, সেও দুঃসাধ্য। খেলায় রাত্রিবাস করে সকালে যাত্রা।

মাইল দেড়েক উৎরাইয়ের পরে ধোলী গঙ্গা। তারপর পঙ্গুর পাহাড়। উপরে আছে পঙ্গু নামে গ্রাম। এ সব পাহাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হয় না যে আমরা এই চড়াই ভেঙে উপরে পৌঁছতে পারব। এই পাহাড়ের পরপারে কিছু আছে বলেও বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। কিন্তু উপায় নেই। আঁকাবাঁকা পথে যাত্রীরা কোমর বাঁকা করে লম্বা লাঠির উপরে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে যায়। আমরাও উঠি। কষ্টের শেষ নেই। একজন আর একজনকে উৎসাহ দিতে পারি না। উৎসাহের উৎস ফুরিয়ে গেছে। একটা চড়াই শেষ হলে আর একটা চড়াই আসবে। একটা উৎরাইয়ের পর আর একটা উৎরাই। কিন্তু সমতল পথ নেই সম্মুখে।

কালী নদীর পুল আমরা দুবার পেরলাম। একবার পেরলে নেপাল রাজ্য, আর একবার পেরিয়ে ভারতের মাটিতে ফিরে এলাম। পাহাড় থেকে অনেক ঝর্ণা এই কালী নদীতে এসে পড়েছে। পথে তার গর্জন শুনে আমরা অগ্রসর হই।

কোথাও এই ঝর্ণা সংকীর্ণ পথের উপর দিয়েই বয়ে যাচ্ছে। কঠিন পিচ্ছিল পথ। নিশ্বাস রোধ করে এই পথ পেরোতে হয় পা টিপে টিপে পাহাড়ের দিকে ঝুঁকে। নিজেকে যখন পার হতে হয়, তখন মুখে কোন কথা সরে না। তারপর পেরিয়ে গিয়ে ওপার থেকে পিছনের যাত্রীকে সতর্ক করতে হয়।

দিনের বেলায় জোঁকে আক্রমণ করে মোজার ভিতর থেকে রক্ত শুষে খায়। রাতে পিশু পোকার অত্যাচারে ভাল ঘুম হয় না। তাঁবু আমরা এখনও খাটাই নি। গ্রামে আশ্রয় পেয়েছি কোনখানে, কখনও ধর্মশালা নামের এক দুর্গন্ধযুক্ত নোংরা ঘরে, কখনও ডাক হরকরার ঘরে, কখনও বা কোন দোকানে বা গ্রামবাসীর কাছে। এক এক দলকে এক এক জায়গায় উঠতে হয়েছে। যাঁরা আগে পৌঁছান, তাঁরা ভাল জায়গাটি দখল করেন আগেভাগে, নিজেদের

জন্যে দুধ ও খাদ্যদ্রব্য তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করে ফেলেন। যাঁরা যত পেছনে থাকেন, তাঁদের দুর্গতি তত বেশি।

এই সব দেখে মনে হয়েছে যে সবাই এক সঙ্গে যাত্রা না করে আগে-পরে যাত্রা করাই যেন ভাল। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে গেলে সব জিনিসেরই সুবিধা হতে পারে। কিন্তু সে সুবিধার কথা আমরা ভাবি না, অসুবিধাকে সহজেই মেনে নি। এক সঙ্গে যাত্রার বিধিকে আমরা গভীর ভাবে সম্মান করি।

এমনি করে পথ চলতে চলতে আমি থেনডুপ লামার কথা ভাবছিলাম। সামনে ও পিছনে দেখছিলাম ফিরে ফিরে। অনেক যাত্রীর ভিড়েও লামাকে চিনতে আমার কষ্ট হত না। কিন্তু কোথাও তাকে দেখতে পেলাম না।

তার বদলে দেখা হয়ে গেল সেই বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে। রামকৃষ্ণ কুটীরে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল। আমিও কৈলাসযাত্রী কি না আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি না বলেছিলাম। ভদ্রলোকের সে কথা মনে ছিল। এক নজরে চিনতেও পেরেছিলেন আমাকে। একটা ঝর্ণার ধারে পাথরের উপরে বসে বিশ্রাম করছিলেন। আমাকে দেখতে পেয়েই বিস্ময় প্রকাশ করলেন ঃ এ কি, আপনি!

কোন উত্তর না দিয়ে আমি শুধু হাসলাম।

ভদ্রলোক বললেন: তবে যে বললেন, আপনি কৈলাস যাবেন না!

বললাম: স্বেচ্ছায় যাচ্ছি নে, আপনারাই আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন।

আমরা!

মানে, আপনাদের মতই আর একদল যাত্রী।

ভদ্রলোক নিজের পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, এত বড় ভুল জীবনে আর কখনও করি নি।

ঝর্ণার এক আঁজলা জল খেয়ে আমি তাঁর পাশে এসে বসলাম। ভদ্রলোক বললেন: কৈলাসে পৌঁছে কী মোক্ষলাভ হবে জানি নে, পথেই মোক্ষলাভ না হলে বাঁচি।

মৃত্যুর পরে হয় মোক্ষলাভ, কিন্তু বাঁচবার জন্যে মোক্ষের কথা কেন ভাবছেন! পায়ে কি মশা বেশি কামড়েছে, না পথে জোঁকে ধরেছিল?

কথাটা তাহলে মিথ্যে নয় দেখছি।

কোন্ কথা?

মশায়ের একটু লেখাপড়ার অভ্যাস আছে শুনেছি। মানে, আড্ডায় পৌঁছে খাতা-পেন্সিল নিয়ে নাকি বসা হয়। মুখের কথাগুলিও তাই কবিতার মতো।

আমি কোন উত্তর দিলাম না।

ভদ্রলোক কাতর স্বরে বললেন, অনুগ্রহ করে আমার নামটি আপনার খাতায় লিখে রাখুন। শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য, নিবাস হালিশহর। রামপ্রসাদের ভিটেয় কখনও এসেছেন?

আজ্ঞে না।

যদি কখনও আসেন. আমার খোঁজ করবেন। সৎকাজের জন্য না হোক, অকাজের জন্য আমাকে অনেকেই চেনে। তারা আমাকে ডেকে দেবে। আর একটা কথা, যদি এই কৈলাস যাত্রার কথা লেখেন, অভ্যাস থাকলে লিখতেই হবে, এই অধমের নামটি ঢুকিয়ে দেবেন। তীর্থ ধর্ম করি, এ কথা লোকে বিশ্বাস করে না তো, ছাপার অক্ষরে দেখলে হয়তো করবে।

নাও করতে পারে।

কেন?

লোকে ভাবতে পারে, আলমোড়ায় বসে এই ভ্রমণ-কাহিনী লেখা হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদ করে।

বলেন কি, আপনারা কি না গিয়েও আজকাল ভ্রমণ-কাহিনী লেখেন নাকি!

আমি বললাম: ইতিহাস না পড়েও যদি ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা যায় তো ভ্রমণ-কাহিনী লেখবার জন্যে বেড়াবার দরকার কী!

ভদ্রলোক একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন: বিচিত্র নয়। যে দেশে রোগের ইনজেকশনে জল থাকে, আর—থাক সে কথা।

বলে তিনি থেমে গেলেন। আমি তাঁর এই মন্তব্যের পিছনে একটা গভীর ক্ষোভ দেখতে পেলাম।

পথ চলতে চলতে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনার সেই লামা কোথায়?

থেনডুপ লামা? কী জানি মশাই, তার মতিগতি কিছুই বুঝতে পারছি না।

কেন?

ভদ্রলোক বললেন: এই আছে, এই নেই। আসকোটে আমাদের সঙ্গে ছিল, তারপর উধাও। সবাই ভেবেছিলাম, বোধহয় কোট পড়েছে। তারপর আবার হঠাৎ ধারচুলায় দেখা। কোন্ পথে কী ভাবে এল তা জানি নে। কিছু জিজ্ঞেস করলে শুধু হাসে।

আমি বললাম: এ দিকে বোধহয় ওর আত্মীয়-স্বজন আছে। তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে এগোচ্ছে।

পঞ্চাননবাবু বললেন: ওতো মশাই তিব্বতী লামা, ওর আত্মীয়-স্বজন এদিকে থাকবে কেন?

দেশ থেকে তো চলে এসেছে অনেকে। বন্ধু-বান্ধব হয়তো আছে।

জানি না মশাই।

বলে ভদ্রলোক লাঠি ঠুকে ঠুকে হাঁটতে লাগলেন।

আমার মনে হল যে গার্বিয়াংএ আবার দেখা হবে থেনডুপ লামার সঙ্গে। মানস সরোবরে সে শুধু তীর্থের বাসনা নিয়ে যাচ্ছে না, যাচ্ছে তার চেয়েও বড় কোন প্রয়োজনে। সেই প্রয়োজনের কথা সে কাউকে বলে নি।

গার্বিয়াং থেকে আমাদের যাত্রা কিছু সহজ হল। ঘোড়া আর ঝব্বু পাওয়া যায় এখানে। ঝব্বু হল মহিষের মত এক রকম জানোয়ার। মাল ও যাত্রী বহন করে। দুর্গম পার্বত্য পথের বিশ্বস্ত সঙ্গী। কিন্তু প্রথমটায় খুব সাবধানে চাপতে হয়। নাকের দড়ি টেনে না ধরলে ঝাড়া দিয়ে ফেলে দিতে পারে।

গার্বিয়াং ভারতের সীমান্তের কাছে শেষ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। অনেকগুলি দোকান আছে। খাদ্যদ্রব্যের অভাব নেই, হাতে বোনা জামা-কাপড় পাওয়া যায়, থুল্‌মা নামের গরম কম্বল আর পশমের মোজাজুতো। তাঁবুও ভাড়া পাওয়া যায়। যাঁরা সঙ্গে তাঁবু আনেন নি, তাঁরা এইখানেই তাঁবু ভাড়া নিলেন, আর তিব্বতের জন্যে দোভাষী সংগ্রহ করলেন। গার্বিয়াংএ শুধু গাড়োয়ালী নয়, ভোটিয়া আর হুনিয়ারাও আছে। হুনিয়ারাই ভাল গাইড ও দোভাষীর কাজ করে।

আর একটা আশ্বাসের কথা জানতে পারা গেল। গার্বিয়াং থেকে মানস সরোবর ও কৈলাস পরিক্রমা করে ফিরে আসতে দিন কুড়ি সময় লাগে। তাড়াতাড়ি পথ চলতে পারলে আরও কিছু সময় সংক্ষেপ করা সম্ভব। দুর্গম পথে চলবার সময় এ একটা মস্ত বড় আশ্বাস। কষ্টের শেষ কবে হবে, তা জানা থাকলে কষ্ট সহ্য করবার বল পাওয়া যায়।

মায়া এসে আমাকে চমকে দিল, বলল : খবর পেয়েছেন ?

কিসের খবর ?

ওধারের চায়ের দোকানে থেনডুপ লামাকে দেখতে পাওয়া গেছে।

সত্যি নাকি!

মায়া বলল : এত দিন কোথায় ছিল কাউকে বলছে না। মিটমিট করে তাকাচ্ছে আর হাসছে। উঠে পড়ুন তাড়াতাড়ি, পালিয়ে গেলে আর ধরতে পারা যাবে না।

আমি হেসে বললাম : আপনাকে দেখলেই পালিয়ে যাবে।

মায়া বলল : পালাবার আগেই গিয়ে ধরে ফেলব।

সবাই যখন রাত্রিবাসের আয়োজনে ব্যস্ত, আমরা তখন লামার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম।

পালাবার জন্যে থেনডুপ লামা চায়ের দোকানে এসে বসে নি, বসেছে ধরা দেবার জন্যেই। আমাকে দেখতে পেয়েই চোখ ছোট্ট করে হাসল। সেই সরল হাসি, শিশুর মতো সরল। তখন মনে হয় না যে তীর্থদর্শন ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে সে এই পথে চলেছে।

আমি তার কাছে গিয়ে বললাম : কোথায় ছিলেন এত দিন?

লামা বলল, চারি দিক দেখতে দেখতে এলাম।

চারি দিক মানে?

আশপাশের গ্রামও সব দেখে নিচ্ছি।

আমি তার পাশে বসে মায়ার দিকে তাকালাম। বললাম : বসবেন না?

লামা অস্বস্তি বোধ করল, উঠে দাঁড়িয়ে বলল : আমি চলি, কেমন?

লামার এই অস্বস্তি মায়া লক্ষ্য করেছিল। অবিলম্বে বলল : না না, আমি উঠি, চলি, আপনারাই বসুন।

বলে ত্বরিত পদে পালিয়ে গেল।

লামাকে আমি উঠে যেতে দিলাম না, হাত ধরে টেনে আবার বসিয়ে দিলাম। বললাম : চা খেতে খেতে আপনার কাছে গল্প শুনব।

লজ্জিত ভাবে লামা বলল : গল্পের কথা ভুলতে পারছেন না ?

আপনার ব্যক্তিগত কথা হলে হয়তো ভুলে যেতাম, কিন্তু এ যে আপনার দেশের কথা। এর আকর্ষণ অন্য রকম।

থেনতুপ লামা অনেকক্ষণ নীরবে রইল। খুবই অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। দোকানদার যখন চা করে চায়ের ভাঁড় এগিয়ে দিয়েছিল আমি তা হাত বাড়িয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু লামাকে জাগিয়ে দিতে হয়েছিল। সে চমকে উঠেছিল চায়ের ভাঁড় হাতে নেবার সময়। তারপর লজ্জিত ভাবে বলেছিল : কেন জানি না, আপনাকে এই গল্প শোনাবার জন্যে আমারও একটা আগ্রহ দেখা দিয়েছে। আমিও এখানে বসে বসে আপনার কথাই ভাবছিলাম। যদি দেখা হয়, তাহলে আপনাকে আমার অপরাধের কথা খুলে বলব। সেদিনের সেই অপরাধের বোঝা আজও আমি বয়ে বেড়াচ্ছি।

একটু থেমে বলল : সেদিন যদি নামগিয়েল গোম্ফার লামারা আমায় মেরে ফেলত, তাহলে আর আমার এ দশা হত না, অনুতাপে দগ্ধ হতাম না সারা জীবন।

আমি বললাম : কিন্তু সেদিন তো আপনি কোন অপরাধ করেন নি।

করেছি পরে। দেশের মঙ্গল করব বলেই দেশের সর্বনাশ করেছি।

আমি হেসে বললাম : একজন সাধরণ মানুষ কি একটা দেশের সর্বনাশ করতে পারে !

তা পারে না মানি। কিন্তু—

থেনতুপ লামা খানিকক্ষণ ভাবল, তারপর বলল : এই কিন্তু আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না।

বললাম : তার দরকার নেই। আপনি আমাকে তার পরের ঘটনা বলুন। আমি নিজেই বুঝে নেব।

থেনতুপ লামা আমাকে তার জীবনের আর একটা অধ্যায় শোনাল। চীনাদের সঙ্গে তার যোগাযোগের কথা আমি মনোযোগ দিয়ে শুনলাম। সেও এক রোমাঞ্চকর কাহিনী।

এগারো

যখন রোদ উঠল, থেনডুপ তখন অনেকটা পথ এগিয়ে গেছে। নিজেদের গ্রাম তো পেরিয়ে এসেছেই, আরও একখানা গ্রামের সীমানা এসেছে পেরিয়ে। থেনডুপ ভাবছিল, আজ কি দেরিতে সূর্য উঠল, না রাত থাকতেই সে বেরিয়ে পড়েছে। এখন আর পা চলতে চাইছে না। একটু আশ্রয়ের দরকার। দরকার একটু বিশ্রামের। গলাটাও শুকিয়ে উঠেছে, এক বাটি স্যেজা পেলে মন্দ হত না।

স্যেজার নামে থেনডুপের ভয় হল। তিব্বতের সব মানুষ কি স্যেজা খেতে পায়! এ প্রশ্ন আজ তার মনে প্রথম এল, তার নতুন অভিজ্ঞতার প্রশ্ন। গোম্ফার ভিতরে যে কথা একবারও মনে আসে নি, আজ এই উদার দিগন্তের নিচে দাঁড়িয়ে সেই কথাই তাকে পীড়া দিল।

বিস্তীর্ণ রুক্ষ প্রান্তর অকর্ষিত পড়ে আছে। ইট কাঠ দিয়ে কেউ গৃহ নির্মাণ করে নি। বেঁটে পাহাড়ের গায়ে গৃহ দেখেছে মৌচাকের মতো। আগেও দেখেছে। কিন্তু আজ দেখছে অন্য চোখে। আজ তাদের দারিদ্র্য দেখা দিয়েছে বড় হয়ে। এই লোকগুলো জীবন ধারণ করে কী খেয়ে!

দূরে দূরে ব্রাহ্মী শাকের মতো কাঁটা গুল্মের ঝোপ। সেখানে দু একটা ইয়াক চরছে। শুধু ঐ কাঁটা খেয়েই তারা বাঁচে, না আরও কিছু খেতে পায়! কে ওদের খেতে দেয়! যে মানুষগুলোর নিজেদেরই খাদ্যের সংস্থান নেই, তারা কি জানোয়ারদের খাওয়াবার কোন চেষ্টা করে!

ছ্যাতেন বলছিল, তারা বড়লোক। তাদের লু আছে, ইয়াক আছে, চাকর তাদের জমি চাষ করে। আর কী চাই। কিন্তু থেনডুপ যে এই লোকগুলোর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। বড় জোর

দু-একটা ইয়াক আছে, তাদের ধরে এনে খানিকটা দুধ পাবে। ঐটুকু ঘরে ছাতু নিশ্চয়ই জমা নেই। ওরা কি জানোয়ার মেরে এনে ঝলসে রেখেছে!

থেনডুপ পথের ধারের একটা পাথরের উপরে বসল। আজ তার অনেক আজগুবি কথা মনে আসছে। তিব্বতের কোন্ রূপটা সত্য! তাদের গোম্ফার ভিতরে যে রূপ সেইটে, না আজ সে চারি দিকে যা দেখছে তাই? হয়তো এ দুটোর কোনটাই সত্য নয়। তিব্বতের তৃতীয় রূপ আছে তার অভিজ্ঞতার বাইরে।

সহসা থেনডুপের নিজের কথা মনে হয়। বাঁচতে হলে প্রথমেই চাই আহার। সেই আহারের সংস্থান কোথা থেকে হবে? তার জমি নেই যে চাষ করতে পারে, তার জানোয়ার নেই যে পশু পালন করবে. ব্যাধের বৃত্তি নয় বৌদ্ধ লামার। থেনডুপ নিশ্চিন্ত হল যে স্বাধীন ভাবে কোন কাজ করবার সুযোগ সে পাবে না। না পাক। শ্রম দান করেই সে জীবিকার্জন করবে। কিন্তু কার কাছে করবে শ্রম দান! কে তার শ্রমের মূল্য দেবে!

কত গ্রামবাসী এসেছে তাদের গোম্ফার ভিতর. কত উপহার এনেছে। কিন্তু এ সব প্রশ্ন কেউ তাকে করে নি. সেও করে নি কাউকে। নিজেরা অভুক্ত থেকেও কি তারা উপহার দিয়েছে! না, তাদের বাধ্য করা হত এই উপহার দিতে! না না, মুখের গ্রাস কেড়ে আনবার জন্য বড় লামা নিশ্চয়ই কাউকে হুকুম করতেন না।

থেনডুপের হঠাৎ মনে হল. অনেকটা দূরে যেন কয়েকটা মানুষ দেখা যাচ্ছে। কোন বসতি নেই. কোন গ্রাম নেই মানুষ কোথা থেকে এল! কী করছে ওরা!

থেনডুপ আর বসল না। ভাবল. ঐ মানুষগুলোকে গিয়ে ধরতে হবে। ওরা কী করে তা জানা দরকার। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ না হলে জীবনটাকে তার জানা হবে

না। রঙীন কাচের ঠুলি তো চোখ থেকে নামিয়ে ফেলেছে, এবারে তার নতুন অভিজ্ঞতা হোক।

মানুষগুলির কাছে পৌঁছে থেনত্নপ আশ্চর্য হয়ে গেল। তারা তিব্বতী নয়, চেহারায় চীনা মনে হচ্ছে। কিন্তু পোশাক পরেছে অদৃষ্টপূর্ব। থেনত্নপ এমন পোশাক কখনও দেখে নি। একেবারে আঁটসাঁট পোশাক। তার মতো ঢিলেঢালা ছুব্বা নয়। তারা পায়ে চলার পথের উপরে যন্ত্র লাগিয়ে মাপজোখ করছে। একজন হেসে তাকে সম্বর্ধনা করল। বলল, কি লামা, খবর কী?

পরিষ্কার তিব্বতী ভাষা বলছে। থেনত্নপ আশ্চর্য হয়ে গেল।

লোকটি আবার বলল, কথা কইছ না যে?

থেনত্নপ এবারে বলল, তোমরা কোন্ দেশের লোক?

কেন, তোমাদের দেশের না হলে কি তাড়িয়ে দেবে?

আমি তাড়াবার কে?

কেন, দেশ তো তোমাদেরই। তোমরা লামারাই তো দেশের হর্তাকর্তা বিধাতা!

থেনত্নপ বলল, আমাকেই তো তারা তাড়িয়ে দিয়েছে। এখন যে আমাকে কাজ দেবে, আমি তারই দলে।

বল কি!

সেই যুবক তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে পাথরের উপরে বসল। থেনত্নপ দেখল, আর দুজন মানুষ কাজ করছে। একজন একখানা কাঠের দণ্ড ধরেছে, তাতে সাদা কালো দাগ কাটা আছে। আর একজন একটা তিন-পেয়ে স্ট্যাণ্ডের উপরে একটা যন্ত্র লাগিয়ে তার ভিতর দিয়ে দণ্ডটা দেখছে। থেনত্নপের ইচ্ছা হল জিজ্ঞাসা করে, ওরা কী করছে। কিন্তু তার সুযোগ পেল না।

সেই বিদেশী যুবক বলল, তুমি কাজ করতে চাও?

কেন, এদেশের কোন লোক কি কাজ করতে চায় না?

শুনলে মূর্ছা যাবে না তো?

না।

সেই যুবক বলল, আমার উত্তরও, না।

তোমরা কোন্ দেশের মানুষ? চীনের?

কী করে চিনলে?

তোমাদের কথা শুনেই তো আমি এ দিকে আসছি।

তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে, তুমি গোম্ফা থেকে নেমে আসছ।

ঠিকই মনে হচ্ছে। কাল রাতে আমি সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছি।

থেনডুপের একবার ইচ্ছা হল বলে যে সেখানে থাকলে সে বড় লামা হতে পারত। কিন্তু তারপরেই তার গোম্ফা ছাড়ার কারণ বলতে হবে। থেনডুপের আজ মনে হচ্ছে যে গোম্ফা তাকে ছাড়তেই হত। ওয়াঙচুক লামারা চক্রান্ত করে তাকে তাড়াতেন, কিংবা মেরে ফেলতেন। তারপরেই বড় লামার কথা তার মনে পড়ল। তিনি তাকে চীনাদের সঙ্গে যোগ দেবার অনুমতি দিয়েছেন।

চীনা যুবকের বিস্ময়ের যেন সীমা নেই। চেঁচিয়ে তার সহকর্মীদের কাছে ডাকল। বলল, আজ কার মুখ দেখে আমরা উঠেছি বল তো?

কেন? কেন?

দুজনেই এগিয়ে এল এক সঙ্গে।

এই লামা আমাদের কী বলছে শোন।

এদের আচরণে থেনডুপের ভারি আশ্চর্য লাগছিল। বলল, এদেশে তোমরা কত দিন আছ?

দিন নয়, মাস নয়, বছর বল। এদেশে আমরা কয়েক বছর ধরে কাজ করছি।

কয়েক বছর! তোমাদের খবর তো আমরা কাল শুনেছি।

সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে এই চীনা যুবক কী বলল, থেনডুপ তা বুঝল না। একজন তাদের মোটর বাইকের পিছন থেকে টিফিন

বাস্কেটটা নামিয়ে আনল। আর একজন বলল, এস লামা, কিছু খাওয়া যাক, তোমার মুখ বড় শুকনো দেখাচ্ছে।

বাক্স থেকে রুটি-মাখন-ডিম বেরল, ফ্লাস্কে চা, চীনা যুবক থেনতুপকেই আগে রুটি আর ডিম এগিয়ে দিল।

ভয়ে ভয়ে থেনতুপ জিজ্ঞাসা করল, এটা কী?

রুটি।

আর এটা?

ডিম।

মাংস নয় তো?

এক সঙ্গে সবাই হেসে উঠল। বলল, না।

থেনতুপ লজ্জা পেয়েছিল। তারপরেই ভাবল, লজ্জা পেলে পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় তার হবে না। নূতন শিশুর মতো আজ তার প্রথম পদক্ষেপ। থেনতুপ ওদের মতো করেই রুটি আর ডিম খেতে লাগল কামড়ে কামড়ে।

ফ্লাস্ক খুলে ওরা যখন চা ঢালল ছোট ছোট গেলাসে, থেনতুপ বিজ্ঞের মতো বলল, স্যেজা তো?

সেই চীনা যুবকটি বলল, চায়ে মাখন মিলিয়ে আমরা পয়সা নষ্ট করি না। এ শুধু চা।

থেনতুপ তার উত্তর শুনে আশ্চর্য হল। মাখন আবার পয়সা কী করে হল! মাখন তো অমনি আসে, গ্রামের লোকেরা দিয়ে যায় ভারে ভারে। চায়ের সঙ্গে না মেশালে অত মাখন মানুষ খাবে কী করে! কিন্তু থেনতুপ আর প্রশ্ন করল না। নতুন লোকের কাছে তার বোকামি হয়তো বেশি প্রকাশ পেয়ে যাবে।

তাড়াতাড়ি করে চা শেষ করে দুজনে কাজে লেগে গেল। সেই যুবকটি রইল থেনতুপের কাছে। বলল: তোমার নাম কী লামা?

টাশি থেনতুপ। তোমার?

তাই ফুঙ।

তোমরা এ সব কী করছ ?

জরিপ।

সে আবার কী ?

জমির মাপজোখ। পেছনে আমাদের বড় দল আছে, তারা বড় বড় বুলডোজার নিয়ে রাস্তা তৈরি করতে আসবে। রাস্তা করব, পুল তৈরি করব, নদী বাঁধব। তোমাদের দেশের মাটি আর খাঁ খাঁ করে পড়ে থাকবে না। আমাদের দেশের মতো এখানেও সোনা ফলবে।

অনেক কথাই থেনডুপ বুঝতে পারল না। চেয়ে রইল হাঁ করে। তাই ফুঙ বলল, আরও পেছনে আর এক দল আছে। তারা জমি চাষ করবে, স্কুল কলেজ হাসপাতাল খুলবে। দেশের সমস্ত ছেলেমেয়ে লেখাপড়া শিখে—

কথার মাঝখানেই থেনডুপ বলল, মেয়েরাও শিখবে ?

তাই ফুঙ আশ্চর্য হয়ে বলল, কেন শিখবে না !

থেনডুপের মনে পড়ল যে শৈশবে ছ্যাতেনকে তার পড়াবার ইচ্ছা ছিল। বড় লামাকে সে অনেক বলেছে, অনেক কান্নাকাটি করেছে। শেষ পর্যন্ত তিনি বলেছিলেন যে থেনডুপ বড় হয়ে যেন অনুমতি দেয়। বড় লামা ঠিকই বুঝেছিলেন যে অনুমতি এক দিন দিতেই হবে। সহসা তার চোখজোড়া ছলছল করে উঠল।

তাই ফুঙ তাকে লক্ষ্য করছিল। বলল, কী হল থেনডুপ ?

থেনডুপ বলল, আমার শৈশবের স্বপ্ন তাহলে সফল হবে।

বল কি, তুমি এ সব স্বপ্ন দেখতে !

সেই জন্যেই তো আমাকে আজ গোম্ফা ছেড়ে তোমাদের কাছে আসতে হল।

কথাটা বলে ফেলেই সে ভাবল, বোধহয় মিথ্যা বলেছে। না না, মিথ্যা কেন হবে ! এদের খবর না জানলে তো সে এদিকে আসত না ! মাথা নিচু করে গোম্ফাতেই গিয়ে আশ্রয় নিত। সে শুধু একটুখানি সত্য গোপন করেছে।

তাই ফুঙ বলল, সত্যি তুমি আমাদের দলে যোগ দেবে ?

আনন্দে থেনড়ুপের বুক ভরে গেল। বলল, দেব বৈকি। আমাদের দেশকে তোমরা ভালবাস, তোমাদের আমি ভালবাসব না!

অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভাবে তাই ফুঙ তাকে জড়িয়ে ধরল।

মোটর বাইকের পিছনে বসিয়ে থেনড়ুপকে তাই ফুঙরা ক্যাম্পে নিয়ে এল। অসমতল পথ বিদ্যুৎগতিতে অতিক্রম করবার সময় থেনড়ুপের ভয় হচ্ছিল, হয়তো ছিটকে পড়ে যাবে। শক্ত করে ধরে থেকেও খুব বেশি ভরসা পাচ্ছিল না।

ক্যাম্পে পৌঁছে থেনড়ুপ আরও চমকে গেল। এ যেন নূতন জগৎ। রাতারাতি তার পরিচিত পৃথিবীটা যেন পালটে গেছে। কোথায় ছিল, আর কোথায় এসে যে পৌঁছেছে! পায়ে হেঁটে নয়, জানোয়ারের পিঠে চড়ে নয়, এত পথ এমন সহজে সে পেরিয়ে এল! তাদের গোম্ফায় তো এই নূতন পৃথিবীর খবর এত দিন পৌঁছয় নি!

কি লামা, কী ভাবছ ?

থেনড়ুপ তাকিয়ে দেখল, হাসিমুখে তাই ফুঙ তাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করেছে।

তারা একটা প্রাঙ্গণে এসে নেমেছিল। চারিধারে ব্যারাকের মতো পাকা বাড়ি, উপরে অ্যাসবেস্টসের ছাদ। এধারে ওধারে কিছু মরসুমি ফুলের গাছ, খেলার মাঠও আছে। মোটর বাইকের আওয়াজ পেয়ে জনকয়েক ছেলেমেয়ে এল বেরিয়ে। একজন চেঁচিয়ে উঠল, আরে আরে, নতুন মানুষ পেলে কোথায় ?

কেউ বলল, লামা নাকি ?

থেনড়ুপ এ সব কথা বুঝল না। চীনা ভাষা তো সে জানে না। সে ভালমানুষের মতো তাই ফুঙের উত্তর দিল, কিছু ভাবছি না তো।

একটি মেয়ে এগিয়ে এসে থেনড়ুপের হাত ধরল। ভাষায় অভ্যর্থনা করল, এস এস।

থেনডুপ এই উষ্ণ স্পর্শের পরিচয় পেয়েছে। ভয় পেল না, শিহরেও উঠল না। সহজ ভাবে বলবার চেষ্টা করল, চল।

এত বড় ব্যারাকে মাত্র কয়েকজন ছেলেমেয়ে। ঘরে ঢোকবার আগে থেনডুপ চারিদিকে একবার চেয়ে দেখল। সেই মেয়েটি বলল, ফাঁকা কেন?

মেয়েটি খুব বুদ্ধিমতী তো! কী করে বুঝল তার মনের কথাটা!

মেয়েটি নিজেই বলল, সবাই কাজে বেরিয়েছে, এবারে একে একে ফিরবে। আমরা তোমাদের আগে ফিরেছি।

এই মেয়েরাও কাজ করে! পুরুষদের সঙ্গে একই কাজ! কিন্তু থেনডুপ কোন প্রশ্ন করবার সাহস পেল না। নিজের মূর্খতাই তাতে প্রকাশ পাবে। মেয়েটার সঙ্গে ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকে পড়ল।

তাই ফুঙ বলল, চা কে খাওয়াবে?

তৈরি হচ্ছে। কিন্তু এই লামাকে কোথায় পেলে?

থেনডুপকে সবাই ঘিরে বসল।

এরা সব কথা তিব্বতী ভাষায় বলে না। বেশির ভাগ কথাই বলে তাদের নিজেদের ভাষায়। থেনডুপ বোঝে না। চুপ করে থাকে। তবে লোকগুলো বোকা নয় বলে তাকে চীনা ভাষায় কোন প্রশ্ন করে না। একজন বলল, বড় সাহেব আজ তোমাদের উপর ভারি খুশী হবে।

তাই ফুঙ বলল, কেন বল তো?

আজ তোমরা লামাকে দলে পেয়েছ। এত দিন তো আমরা সেই, কী বলে, ক্রীতদাস ছাড়া আর কাউকে দলে আনতে পাচ্ছি না।

টং ডু বলো।

ঐ হল। ওদের বেশির ভাগই তো বড়লোকের কেনা গোলাম। কটা লোক আর স্বাধীন ভাবে উপার্জন করছে!

থেনডুপের দিকে ফিরে একজন প্রশ্ন করল, তোমার জাত কি লামা?

লামার আবার জাত কী!

মানে, লামা হবার আগে তো একটা জাত ছিল!

থেনডুপের ভারি আশ্চর্য লাগে। লামা বলে তাকে চিনছে কী করে! তার গায়ে কি কোন চিহ্ন দেওয়া আছে! তাড়াতাড়ি সে নিজের দিকে একবার তাকাল। তাই তো, তার উপাসনার পোশাকটা তো বদলানো হয় নি, আজ সকালবেলায় সে এই পোশাক পরেছিল। বলল, আমি তোমাদেরই জাত।

একজন বলল, সাবাস সাবাস।

আর একজন চেঁচিয়ে উঠল, আমরা তো মজুরের জাত।

তাই ফুঙ বলল, বড় সাহেব ফিরলে ওর নাম খাতায় তুলে দিও। ওর নাম টাশি থেনডুপ।

একজন এগিয়ে এসে বলল, আমার নাম কাম লুঙ।

আমার নাম তাই ফিঙ।

আর আমার নাম মিঙ সুন।

সেই মেয়েটি বাধা দিয়ে বলল, আমার নাম বুঝি জানবার ইচ্ছে নেই?

তাই ফুঙ বলল, তোমার নাম তো সুন্দরী।

আবার ঠাট্টা!

ঠাট্টা কিসের। তুমি সুন্দরী, তোমাকে সুন্দরী বললেই আপত্তি

মেয়েটি বলল, এরই মধ্যে তোমার শাস্তির কথা ভুলে গেলে ধিক্ তোমাকে।

এদের তর্কের বিষয় জানতে থেনডুপের ভারি কৌতূহল। বলল, কী বলছ তোমরা?

তাই ফুঙ বলল, ও, তুমি বুঝি বুঝতে পার নি! আচ্ছা, তুমিই বল ওর কী নাম হওয়া উচিত।

আমি কী করে বলব ?

কুৎসিত ?

সুন্দর মেয়ের নাম কেন কুৎসিত হবে।

সাবাস থেনডুপ লামা। তবে সুন্দরী নাম ?

উৎসাহ পেয়ে থেনডুপ বলল, সেটা বরং চলতে পারে।

সাবাস সাবাস।

বলে তাই ফুঙ একেবারে লাফিয়ে উঠল। সকলের উল্লাস আর ধরে না।

সবাইকে অবজ্ঞা করে মেয়েটি থেনডুপকে বলল, আমার নাম চিঙ লিঙ।

তাই ফুঙ গম্ভীর হয়ে বলল, জান থেনডুপ, চিঙ লিঙ আমার নামে লাগিয়েছিল বলে বড় সাহেব আমাকে ওদের দল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। দিন তাড়িয়ে। সত্যকথা আমি একশো বার বলব।

চিঙ লিঙ বলল, বলবে বৈকি। এবারে একেবারে দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করব।

তাই ফুঙ বলল, ভেবো না যে একা যাব।

আর একজন বলল, তোমরা এত ঝগড়াও করতে পার।

মাথা নেড়ে থেনডুপ বলল, বেশি ভাব কিনা তাই।

সাবাস সাবাস। বলে সমস্বরে সবাই চেঁচিয়ে উঠল।

বেলা তখন পড়ে আসছে। নানা রকমের শব্দ আসছে ভেসে। থেনডুপ বারে বারেই বাহিরের দিকে তাকাচ্ছে। কত রকমের অদ্ভুত যান-বাহন। জীপ ট্রাক রোলার বুলডোজার। থেনডুপ এ সব কিছুই দেখে নি। গোম্ফার বাহিরে এত মানুষও কখনও এক সঙ্গে দেখে নি। যেন মেলা বসতে শুরু করেছে। সব চেয়ে আশ্চর্য লাগছে দেখে যে কারও মুখ ভার নয়, সবাই আসছে চেঁচাতে চেঁচাতে। কে খেতে দেবে, কী খেতে দেবে? তারা সারা দিন

কাজ করেছে। এবারে তারা খাবে, খেলবে, আর নাচ গান করবে।

বড় সাহেব থাকেন খানিকটা দূরে। একটা ছোট বাড়িতে। সেখানে আরও কয়েকজন সাহেবসুবো থাকেন। তাঁদের অফিসও সেইখানে। সন্ধ্যাবেলায় বড় সাহেব এসে একবার ঘুরে যান, ভালমন্দ জিজ্ঞাসা করেন, এক সঙ্গে খানও কোন কোন দিন। থেনতুপ ভাবছিল, এই বড় সাহেব লোক কেমন! যদি তাকে দলে না নেন! সে তো কোন কাজই জানে না। তার মতো অপদার্থ কোন লোককে নিয়ে তারা কী করবে!

তাই ফুঙ তাকে একটা ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিল, বলল, কী ভাবছ কবির মতো?

আমতা আমতা করে থেনতুপ বলল, বড় সাহেব কখন আসবেন?

কেন, কোনও কথা আছে নাকি তাঁর সঙ্গে?

ভাবছিলাম, আমাকে তিনি তোমাদের সঙ্গে থাকতে দেবেন তো!

তাই ফুঙ হা হা করে হেসে উঠল।

অপ্রতিভ ভাবে থেনতুপ বলল, হাসছ কেন?

হাসছি তোমার কথা শুনে।

চিঙ লিঙ বলল, ওকে বুঝিয়ে বল ব্যাপারটা।

তারপর নিজেই বলল, সেজন্যে তোমার কোন ভাবনা নেই। আমরা ধরে ধরে লোক আনছি। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করবার জন্যে আমাদের অনেক লোক দরকার।

কিন্তু আমি তো কোন কাজ জানি নে।

তোমার উপযুক্ত কাজই তুমি পাবে। কিন্তু এই আলখাল্লা তোমাকে ছাড়তে হবে।

কেন?

এই ঢিলেঢালা পোশাক পরে কি কাজ করা যায়!

কিন্তু আমার তো আর অন্য পোশাক নেই।

চিঙ লিঙ হেসে বলল, সে ভাবনাও তোমার নয়। তুমি এখানে কাজ করবে বলেছ, তোমার সব ভাবনা এখন থেকে সাহেবরা ভাববে।

থেনডুপের মনে হল, এ ব্যাপারটাও ঠিক গোম্ফার মতন। একবার লামা হয়ে গোম্ফায় ঢুকতে পারলে আর কোন ভাবনা ভাবতে হয় না। ভাবে অন্য লোকে। কিন্তু কিছু তফাৎ নিশ্চয়ই আছে। পরে হয় তো সে বুঝতে পারবে।

তাই ফুঙ বলল, আজ থেনডুপের খাতিরে আমাদের একটা গান হোক।

চিঙ লিঙ বলল, নাচ হবে না?

কে নাচবে?

নাচবে থেনডুপ লামা, এস এস।

বলে চিঙ লিঙ থেনডুপের হাত ধরে টানল। এর হাতখানাও বুঝি ঠিক ছ্যুতেনের মতো! থেনডুপ আশ্চর্য হয়ে ভাবল, সব মেয়েদের হাতই কি ছ্যুতেনের মতো! ছ্যুতেন এখন কী করছে! আর বড় লামা!

সকলের মতো থেনডুপও একখানা ফোল্ডিং খাট পেয়েছে, চাদর-বালিশ আর কম্বল। রাতে পরবার পোশাকও পেয়েছে। কিন্তু সবার সঙ্গে সে শুতে গেল না। তাই ফুঙ তার পোশাক বদলে দেখল যে থেনডুপ বারান্দায় বসে আছে তার পা ঝুলিয়ে। আকাশের দিকে তাকিয়ে হয়তো আকাশ পাতাল ভাবছে। তাই ফুঙ কথা না বলে তার পাশে এসে বসল। কিন্তু থেনডুপের ধ্যান তাতে ভাঙল না। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে তাই ফুঙ বলল, কী ভাবছ লামা?

থেনডুপ কোন উত্তর দিল না।

তাই ফুঙ প্রশ্ন করল, গোম্ফার জন্যে মন কেমন করছে?

না।

তবে কি নতুন ধরণের খাবার খেয়ে তোমার পেট ভরে নি?

ভরেছে।

তাই ফুঙ বলল, এবারে বুঝতে পেরেছি, তুমি কার কথা ভাবছ।

থেনডুপ চমকে উঠে বলল, কার কথা বলতো!

বিজ্ঞের মতো মাথা ত্থলিয়ে তাই ফুঙ বলল, কেন বলব!

থেনডুপ আবার আকাশের দিকে তাকাল। মুক্ত নীল আকাশ ছোট বড় অগণিত তারায় কণ্টকিত হয়ে আছে। চাঁদ উঠেছে কি না দেখা যাচ্ছে না। থেনডুপ তাই ফুঙের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, তার চেয়ে তুমি চিঙ লিঙের কথা বল।

সে কিগো, লামা হয়ে তুমি মেয়ের কথা শুনতে চাইছ!

মেয়ে কি মানুষ নয়!

তাই ফুঙ আশ্চর্য হয়ে তাকাল তার মুখের দিকে। তিব্বতের কোন লামা যে এমন কথা বলতে পারে, এ তার বিশ্বাস হচ্ছে না। এ তো পুরনো পৃথিবীর কথা নয়। পুরনো পৃথিবী আজও মনে প্রাণে এ কথা মানতে চাইছে না। তাদের পুরনো ধারণা আজও বদ্ধমূল হয়ে আছে। তাদের ধারণা যে নারীর সৃষ্টি হয়েছিল পৃথিবীর প্রয়োজনে, পৃথিবীর সৃষ্টি রক্ষার জন্য। এ ধারণা যে পৃথিবী থেকে সহজে যাবে না, তাই ফুঙ তা বোঝে। আর বোঝে বলেই থেনডুপের কথায় আশ্চর্য হয়। তাই ফুঙ আস্তে আস্তে বলল, এ তোমার নিজের কথা?

তাই ফুঙের মুখের দিকে তাকাল থেনডুপ।

তাই ফুঙ বলল, মানুষ যদি গোড়াতেই এ কথা বুঝত তো পৃথিবীর চেহারা হত অন্য রকম। এমন অভাব ও কুসংস্কারে এ দেশটা আচ্ছন্ন হয়ে থাকত না।

থেনডুপের রোমাঞ্চ হল এই কথা শুনে। শৈশবের কথা আবার তার মনে পড়ছে। কিছু না বুঝে সেও সেদিন জেদ করেছিল

মেয়েদের সমান অধিকারের। কেন তারা পুরুষের সঙ্গে এক সঙ্গে গোম্ফায় আসবে না, এক সঙ্গে পড়বে না! সেদিন সে ফিরে গিয়েছিল, কিন্তু বড় লামার কথাও সে ভোলে নি। বড় লামা তাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন যে, পৃথিবী বদলাচ্ছে। নতুন পৃথিবীতে এ সব বিধি নিষেধ থাকবে না। মনে মনে তিনি কি এই নূতন পৃথিবীর অপেক্ষাতেই আছেন!

তাই ফুঙ বলল, মেয়েদের তোমরা বন্ধু ভাবতে পার না, তাই তাদের ঘরের কোণায় ফেলে রেখেছ। পুরুষে পুরুষে যদি ভাব হয় তো পুরুষে মেয়েতে কেন হবে না!

থেনড়ুপের খুব ভাল লাগল এই কথা। কিন্তু সবাই কি এই কথা মানতে চায়! ছ্যুতেন কি এ কথা মানবে! তার মতো মেয়ে নিশ্চয়ই আরও অনেক আছে।

তাই ফুঙ বলল, এ কথা তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি! কিন্তু কিছু দিন এখানে থাকলেই তোমার বিশ্বাস হবে।

থেনড়ুপ ব্যারাকের অন্য ধারে তাকিয়ে দেখল। সেদিকটা মেয়েদের জন্যে নির্দিষ্ট। বলল, মেয়েরা তবে আলাদা শুচ্ছে কেন?

ওদের সুবিধার জন্যে। আর—

থেনড়ুপের মনে হল, তাই ফুঙ মানুষের আদিম প্রবৃত্তির কথা বলবে। মানুষ যে এক সময় পশু ছিল, সে কথা বুঝি তার অন্ধকারে মনে পড়ে। আজও তার প্রবৃত্তিকে দাবিয়ে রাখার প্রয়োজন আছে। এই শতাব্দীর সভ্যতায় মানুষ দিনের বেলায় মানুষ সেজে থাকতে শিখেছে। অন্ধকার রাতে বুঝি তার মানুষের মুখোশটা খসে পড়ে। তখন বুঝি মেয়েরা পুরুষের কাছে নিজেদের নিরাপদ ভাবে না। তবু থেনড়ুপ জানতে চাইল, আর কী?

সহসা তাই ফুঙ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না। বলল, আজ থাক সে কথা।

তারপরে থেনডুপ তার আসল প্রশ্নটা করল—যে প্রশ্ন তাকে অনেকক্ষণ ধরে পীড়া দিচ্ছিল সেই প্রশ্ন। বলল, তুমি তো এখানে কাজ দেবার মালিক নও, তবে তুমি কোন্ ভরসায় আমাকে ধরে আনলে ? আর—

আর থাকবার এমন ব্যবস্থা করে দিলাম ?

থেনডুপ বলল, অনেকক্ষণ থেকে আমি এই কথা ভাবছি।

তাই ফুঙ বলল, আমাকে জিজ্ঞেস করলে অনেকক্ষণ আগেই আমি এ কথার উত্তর দিতাম। এ দেশের যেখানে আমরা যাচ্ছি, লামারা আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করছে। তুকতাক মন্ত্র পড়ে যখন কিছু করতে পারছে না, তখন লুকিয়ে থেকে আক্রমণ করছে। অনেকবার আমরা মরতে মরতে বেঁচে গেছি।

চোখ বড় করে থেনডুপ তাই ফুঙের দিকে তাকাল। তাই ফুঙ বলল, দিনের বেলায় আমরা যে কাজ করে আসতাম, রাতারাতি ওরা তা ভেঙে দিত। প্রথম প্রথম আমরা কিছুই বুঝতাম না। ভাবতাম, এ সব বোধহয় ভৌতিক কাণ্ড। বড় সাহেব বললেন, না, এ সব লামাদের কাজ। তাঁবু ফেলে রাতে পাহারা দাও। পাহারা দিয়ে আমরা সব ধরে ফেললাম।

নামগিয়েল গোম্ফার কথা থেনডুপের মনে পড়ল। চীনাদের আগমনের কথা তাদের একজনেরও পছন্দ হয় নি। শুধু বড় লামার সম্মতি ছিল। কিন্তু সেই বুড়ো মানুষটি একা কী করবেন। এরা যখন তাদের গ্রামে যাবে, অন্য লামারা তখন নিশ্চয়ই এদের বাধা দিতে এগিয়ে আসবে।

তাই ফুঙ তার ভাবান্তর বোধহয় লক্ষ্য করেছিল। বলল, কী ভাবছ ?

অন্যমনস্ক ভাবে থেনডুপ বলল, আমাদের গ্রামের কথা ভাবছি। সেখানেও বোধহয় তোমাদের বাধা পেতে হবে।

তাই ফুঙ বলল, সেইজন্যেই তো তোমাকে আমরা দলে নিলাম। তুমি সঙ্গে থাকলে আর আমাদের ভয় নেই।

ওধারের ব্যারাক থেকে একটা গানের সুর ভেসে আসছিল। গানের কথা সে বুঝতে পারছিল না। কিন্তু সুরটি তার ভাল লাগছে। একেবারে নতুন ধরণের সুর। এ নিশ্চয়ই চীন দেশের গান।

তাকে তন্ময় হয়ে শুনতে দেখে তাই ফুঙ বলল, কে গাইছে বলতে পার?

থেনডুপ বলল, সবাইকে তো আমি চিনি না।

যে গাইছে তাকে চেনো?

যে ডাকতে এসেছে তাকেও।

বলে মায়া ধীর খিলখিল করে হেসে উঠল।

থেনডুপ লামা লাফিয়ে উঠল তার আসন থেকে। আমিও চমকে উঠলাম। মায়া বলল: ভয় পাবেন না। আমি পেত্নী নই। রাত যে অনেক হয়েছে তাই জানাতে এসেছি। সবাই আপনার অপেক্ষা করছেন।

আমি লজ্জা পেয়ে বললাম: উঠি আজ।

লামা ততক্ষণে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

ফেরার পথে মায়া বলল: আপনাদের কি শীত বোধ নেই! ঘরের ভিতরেই সবাই আড়ষ্ট হয়ে আছেন, আপনাকে ডাকবার জন্য বেরতে কেউ রাজী ছিলেন না।

সত্যিই তো, শীতে যে আমার হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে গেছে। আমি লজ্জিত ভাবে বললাম: আপনাকে আজ অকারণে কষ্ট দিলাম।

মায়া আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। থেনডুপ লামা দেখলে বলতে পারত, এ হাসি ছ্যাতেনের মতো, না চিঙ লিঙের মতো।

বারো

গার্বিয়াঙে হিমালয়ের চেহারা একটু অন্যরকম। এ আমাদের পরিচিত হিমালয় নয়। হরিদ্বারে আলমোড়ায় আমরা যে হিমালয় দেখি তার নাম শিবালিক শ্রেণী। তার পরের তরঙ্গ তত উঁচু নয়। এই দ্বিতীয় তরঙ্গে আমরা পিথোরাগড় আসকোট পেয়েছি। গার্বিয়াঙ তৃতীয় তরঙ্গে। এই তরঙ্গ ক্রমে ক্রমে উঁচু হয়ে তিব্বতের দিকে নেমে গেছে। হিমালয়ের সমস্ত শৃঙ্গগুলিই এই তৃতীয় তরঙ্গে অবস্থিত। গার্বিয়াঙ থেকে আমাদের আরও উপরে উঠতে হবে। ষোল হাজার ফুটেরও উপরে লিপুলেক গিরিবর্ত্ম পার হতে হবে বরফের উপর দিয়ে। বাতাস হালকা হবে, নিঃশ্বাসের কষ্ট হবে, ঠাণ্ডায় পা ভারী হবে পাথরের মতো। একজন ভয় দেখাল,—এর নাম নাকি বিষ চড়া। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়, দেহের অনাবৃত অংশ পুড়ে যাবার মতো জ্বালা করে, মাথা ঘোরে, চোখ জ্বলে, মনে হয় জ্বর এসেছে কাঁপিয়ে। এ শীতের কাঁপুনি।

গার্বিয়াঙের অন্য লোকেরা সাহস দিয়ে বলল, আর মাত্র তিনটে দিন, তারপরে আর কষ্ট নেই। সেই সঙ্গেই উপদেশ দিল, দুদিনে লিপুধুরা পার হবার চেষ্টা করবেন না, কষ্ট আরও বেশি হবে।

এগারো হাজার ফুট উঁচু গার্বিয়াঙ থেকে আমরা ঘোড়ায় আর টাট্টুতে চেপে যাত্রা করলাম। এই ঝব্বুগুলো আকারে যেমন ভয়াবহ মনে হয়েছিল প্রকৃতিতে তেমন নয়। বোঝা নেবার সময়েই একটু আপত্তি জানিয়েছিল, তারপরে শান্তিতে চলেছে।

কালী নদীর ধারে ধারে আমরা চলেছি। পথ ক্রমেই উপরে উঠছে। দু হাজার ফুট উপরে উঠলে কালাপানি। কিন্তু এগার মাইলে এই পথ উঠতে হয় বলে চড়াই তেমন দুঃসাধ্য মনে হয় না। কালাপানিতেই আমাদের একটা রাত কাটাতে হবে। সঙ্গে যাঁদের তাঁবু ছিল, তাঁরা সবাই এখানে তাঁবু খাটালেন।

কালাপানি নাম কেন হয়েছে, এই নিয়ে গবেষণা হয়েছিল খানিকক্ষণ। কেউ বললে, এখানকার ঝর্ণার জল কালো, পাহাড়ের ভিতর হয় তো কয়লার খনি আছে। কেউ বললে, ঝর্ণার জল এই রকমই হয়, একে কালো জল বলে না। কেউ বললে, জল যে একটু ঘোলা তাতে সন্দেহ নেই। আবার কেউ বললে, বর্ষার জল এর চেয়ে পরিষ্কার হয় না। শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হল যে বছরের কোন সময় বোধহয় এই ঝর্ণার জল কালো দেখা যায়। সেইজন্যেই জায়গার নাম কালাপানি।

মায়া এসে আমাকে বলল: গার্বিয়াঙে কিছু লিখেছেন তো?

আমি এই প্রশ্নের প্রয়োজন বুঝতে পারলাম না।

মায়া বলল: যা লিখেছেন, তার নাম দেবেন পুরাণ।

কেন?

শোনেন নি বুঝি, গার্বিয়াঙের একটা গুহায় বসে ব্যাসদেব পুরাণ রচনা করেছিলেন। গার্বিয়াঙের আর একটা নাম এইজন্যে ব্যাসক্ষেত্র।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম: সত্যি নাকি!

মায়া বলল: সত্যি কথা আপনি জানবেন কী করে! আপনি তো লামাকে নিয়েই সারাক্ষণ ব্যস্ত রইলেন।

তারপরেই জিজ্ঞাসা করল: আপনার লামা কোথায়?

বললাম: আর বোধহয় তার সঙ্গে দেখা হবে না।

কেন?

লিপুলেক পার হলেই তো তার নিজের দেশ। তখন কি আর আমাদের কথা সে মনে রাখবে!

প্রচণ্ড শীতে আমাদের হাত-পা অবশ হয়ে আসছে। গরম জামা-কাপড় যা সঙ্গে ছিল, সবই এখন গায়ে। মুখের একটুখানি অংশ ছাড়া বাকি সবই ঢাকা। পায়ে দু জোড়া মোজা, প্যাণ্টের নিচে উলের ড্রয়ার, পুরোহাত সোয়েটারের উপর গলাবন্ধ কোট,

মাথায় টুপি, গলায় মাফলার, তারই ওপরে গরম চাদর জড়িয়েছি। মিস্টার মাথুর তাঁর ওভার-কোটের উপর কম্বল গায়ে দিয়েছেন। মিসেস ধীর উনুনের পাশে বসে রান্নার তদারক করছেন। এমন সময় আমাদের দোভাষী খানিকটা আরামের ব্যবস্থা করল। তাঁবু-গুলোর মাঝখানে সে একটা আগুন জ্বালল।

মিস্টার ধীর বললেন : কোথা থেকে কাঠ এল ?

জানা গেল যে কাঠ সংগ্রহ হয়েছে পথে। দুজন ঝব্বুওয়ালাকে নিয়ে সে আগে বেরিয়েছিল। বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে ঝব্বুর পিঠে চাপিয়েছে এখানে পৌঁছবার আগে। শুধু আজকের জন্য নয়। কাল এই আগুনের প্রয়োজন আরও বেশি হবে। পুরাঙ্ এখান থেকে পনর মাইল। সমতল হলে এক দিনেই যাওয়া যেত। কিন্তু মাঝখানে ভারত ও তিব্বতের সীমান্তে লিপুধুরা, ষোল হাজার সাত শো আশি ফুট উঁচু। বরফের উপর দিয়ে সে পথ অতিক্রম করা যে কত কঠিন, পরে তা বুঝতে পেরেছিলাম। গার্বিয়াঙের লোকেরা এই জন্যেই আমাদের দু দিনে এই পথ অতিক্রম করবার পরামর্শ দিয়েছিল। নামার পথে পরিশ্রম বেশি নয়, তাই আমরা উঠবার পথেই আর একটা রাত অতিবাহিত করলাম।

সে জায়গার নাম সঙ চিঙ। কালাপানিতেও দু চার ঘর মানুষের বাস দেখেছি, কিন্তু সঙ চিঙে জনমানব নেই। পাঁচ মাইল পথ আমরা ঘণ্টা তিনেকে অতিক্রম করে দুপুরেই সেখানে পৌঁছেছিলাম। এগোবার সময় ছিল, কিন্তু এগোই নি। পনর হাজার ফুটেই আমরা তাঁবু ফেলেছিলাম। আর এমন একটি কঠিন রাত কাটিয়েছিলাম যা আগে কখনও কাটাই নি।

পথের পরিবর্তন আমরা সকলেই লক্ষ্য করেছিলাম। কালী নদীর ধার দিয়ে আমরা অনেক দূর এসেছিলাম। তারপর নদীকে পিছনে ফেলে আমরা একটা ঝর্ণার ধার দিয়ে এগিয়েছিলাম।

পাহাড়ে আর গাছপালা নেই। সম্পূর্ণ অনাবৃত উলঙ্গ পাহাড়। তার শিখরগুলি চিরতুষারাবৃত। পথের ধারে ফুল দেখেছি নানা রকম, বুনো গোলাপও দেখেছি। আর হিমালয়ের নগ্ন রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছি। এ রূপ আমরা আলমোড়ায় দেখি নি, দেখি নি সিমলায় কিংবা দার্জিলিঙে, ভূস্বর্গ কাশ্মীরেও দেখি নি।

সঙ চিঙে যখন আমাদের তাঁবু পড়ল, দিনের আলো তখনও প্রখর। চোখের সামনে লিপুলেক পাহাড়, তার চূড়ার নাম লিপুধুরা। আমরা তার উপর দিয়ে যাব। কিন্তু তার পরেও যে পৃথিবী আছে, এখান থেকে তা বোঝা যায় না।

নির্জন নিস্তব্ধ রাতে আমরা ঘুমতে পারলাম না। দূরন্ত শীত, এমন শীতে তাঁবুর ভিতরে রাত কাটাবার কথা আমরা ভাবতে পারি নে। আমরা কয়েকজন যাত্রী ছাড়া আর কোন প্রাণীর সাড়া নেই। পাখির ডানার শব্দ নেই, ঝিঁঝির ডাক নেই, ঝর্ণার কলতানও এখানে শোনা যাচ্ছে না। আমরা যেন নূতন জন্মের জন্যে প্রহর গণনা করছি।

স্থির হয়েছিল যে, শেষ রাত্রে আমরা যাত্রা করব। সূর্যের আলোয় লিপুলেকের বরফ গলতে শুরু করে, অসতর্ক হলে বরফের স্তূপে পা ঢুকে যায়। তাই আমরা বরফ গলতে শুরু হবার আগেই ঐ বরফের বিস্তার যাব পেরিয়ে। রাত চারটের সময় উঠেছিলাম। তাঁবু গুটিয়ে জিনিস-পত্র বেঁধে যাত্রা করতে আমাদের পাঁচটা বেজে গেল।

খুব ধীরে ধীরে আমরা পথ চলছিলাম। তাড়াতাড়ি চলবার উপায় নেই। ঠাণ্ডায় পা চলছে না। দেহ অবশ হয়ে আসছে। কনকনে বাতাস আসছে সামনে থেকে। নিঃশ্বাসে টান ধরছে আর গলা শুকিয়ে উঠছে। পথে ঝর্ণার জল খেয়েছি অঞ্জলি ভরে, তবু তৃষ্ণার শেষ নেই। এখানে আর ঝর্ণা নেই, জল নেই, শুধু বরফ।

হঠাৎ দেখলাম যে পথ এবারে বরফের উপর দিয়ে। একটুখানি দাঁড়াতেই পাশে একটা কাতরানি শুনতে পেলাম। এক খণ্ড পাথরের উপরে মানুষের আকৃতির একটি বোঝা, মানুষ চেনা যাচ্ছে না। তারপরে শুনলাম একটা কণ্ঠস্বর: কী কুক্ষণেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম!

বাঙলা কথা। সারাক্ষণ হিন্দী শুনে শুনে বাঙলা আর্তনাদটিও কানে ভাল লাগল। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: ভট্চাযি্য মশাই নাকি?

ভদ্রলোক কাতর স্বরে বললেন: আজ্ঞে, আমিই সেই পঞ্চানন ভট্টাচার্য।

আমারও বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। তাঁর পাশে গিয়ে বসতেই বললেন: রামপ্রসাদের ভিটে মনে থাকবে তো? দেশে ফিরে খবরটা সেখানে দিয়ে দেবেন।

কোন্ খবর?

আমাকে যে এইখানে রেখে গেলেন, সেই খবর।

এত কষ্টেও আমার হাসি পেল। বললাম: হার মানলে তো চলবে না ভট্চাযি্যমশাই, তাতে যে আমাদের জাতের অগৌরব হবে। দেখছেন না ঐ মহিলাদের, ওঁরাও যে এগিয়ে গেলেন।

ভদ্রলোক মুখে বললেন: ওঁদের কথা ছেড়ে দিন।

কিন্তু বসে আর রইলেন না। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি।

বলে লাঠি ঠুকে ঠুকে এগোতে লাগলেন।

মেয়েরা ঘোড়া থেকে নেমে হেঁটে যাচ্ছিলেন বরফের উপর দিয়ে ঘোড়ওয়ালারা তাদের হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। তাদের অনুসর করে আমরাও সেই দুর্গম পথটুকু পেরিয়ে গেলাম।

তারপরে লিপুধুরা।

ধীরে ধীরে আমরা এই পর্বতের শিখরে আরোহণ করলাম। পথের ধারে একটি শুকনো গাছ, তার ডালে পাতার বদলে রঙীন কাপড়ের টুকরো বাঁধা, আর গোড়ায় কিছু পাথর আছে সাজানো। তারই পাশে দাঁড়িয়ে আমরা তিব্বতের দিকে প্রথম তাকালাম। মনে হল যেন আমরা সাহারার মতো একটা মরুভূমি দেখছি। কোন গাছপালা নেই, কোন শ্যামলিমা নেই, নেই কোন মানুষের বসতির চিহ্ন। দূরে দিগন্তে শুধু ছোট বড় পাহাড় দেখতে পাচ্ছি, নানা রঙের পাহাড়—সাদা নীল ধূসর ও গৈরিক। তুষারে আবৃত একটি পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে পঞ্চাননবাবু বললেন : ঐটেই কি কৈলাস ?

বললাম : না, ওটা গুরেলা মান্ধাতা পাহাড়।

ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। তাঁর নীরব প্রশ্ন আমি বুঝতে পারলাম, বললাম : এ আমার অনুমান।

সামনের সৌন্দর্য দেখে ভদ্রলোক উৎসাহ পেয়েছিলেন, বললেন : আসুন তাড়াতাড়ি, সঙ্গীরা অনেক এগিয়ে গেছেন।

আমি বললাম : আপনি এগোন, আমি আসছি।

বলে একখানা পাথরের উপর চেপে বসলাম।

পঞ্চাননবাবু খুব সাবধানে নামতে লাগলেন। সামনের খানিকটা পথ বরফে আচ্ছন্ন, সেই পথ সকলকেই অতি সন্তর্পণে পার হতে হচ্ছে। একটু অসাবধান হলে গড়িয়ে নিচে পড়তে হবে। আঘাত লাগবে দেহে, কিন্তু প্রাণ যাবার ভয় নেই। পথ এখানে প্রশস্ত।

আমার এই অপরূপ পরিবেশ বড় ভাল লাগছিল। এখানে বাতাসে ধার আছে, কিন্তু রৌদ্রে জ্বালা নেই। মেঘ আসছে, আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে চারি দিক, তারপরে পাহাড়ের গায়ে আটকে থাকছে। পরিচিত অপরিচিত যাত্রীরা যাঁরা পিছনে ছিলেন, একে একে সবাই এগিয়ে গেলেন। কেউ হাসলেন, কেউ কথা কইলেন। এই দুর্গম পথটুকু অতিক্রম না করে কেউ এখন বিশ্রাম করবেন না।

সহসা আমার মনে পড়ল যে এই বরফের মধ্যে অনেকের পা তলিয়ে যায়। জীবন বিপন্ন হয় অনেকের। এ কথা মনে হতেই আমি উঠে দাঁড়ালাম। সবাই আমাকে ছাড়িয়ে যাবার আগে আমাকেও এই বরফ পেরতে হবে। আমিও এবারে অন্য যাত্রীদের মতো ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হলাম।

তারপর একটি অসহায় মুহূর্ত আমার জীবনে এল। লাঠি ঠুকে পায়ের গোড়ালির উপরে ভর করে আমি নামছিলাম। হঠাৎ কী হল জানি নে, পা পিছলে গেল। গড়িয়ে নিচে পড়বার সময় আমি সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বরফ সেখানে নরম, সেই নরম বরফে আমার লাঠি ঢুকে গেল। মনে হল যেন আমার পা দুখানাও তলিয়ে যাচ্ছে। এই বরফেই কি আমার সমাধি হবে! সমস্ত স্নায়ু আমার অসাড় হয়ে গেল। মুখে আমার শব্দ এল না, কাউকে আমি ডাকতে পারলাম না। দুরন্ত আশঙ্কায় আমি নিজেকে হারিয়ে ফেললাম।

যাত্রীদের দু তিনজন আমাকে লক্ষ্য করে হায় হায় করে উঠেছিলেন। কিন্তু কেমন করে উদ্ধার করবেন ভেবে পান নি। ঐ নরম বরফের উপর এগিয়ে আসতে তাঁদের সাহস হয় নি।

আমাকে উদ্ধার করল থেনতুপ লামা। সে অনেক দূরে ছিল, অনেক পিছনে। গার্বিয়াঙ কালাপানি অঞ্চলেই সে আর একটা রাত বেশি কাটিয়ে শেষ রাতে যাত্রা করেছিল। পুরাঙে আমাদের সঙ্গে তার দেখা হত। লিপুধুরায় দাঁড়িয়ে সে আমাকে দেখতে পেয়েছিল। তাই তাড়াতাড়ি নামছিল আমার পাশে এসে পৌঁছবার জন্য। শক্ত বরফের উপর দাঁড়িয়ে সে আমাকে হাত ধরে টেনে আনল।

সমস্ত দেহ আমার ঠকঠক করে কাঁপছিল। আমি কোন কথা কইতে পারছিলাম না। থেনতুপ লামা অত্যন্ত সহজে আমাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে নিচে নামতে লাগল। যাত্রীদের উদ্বেগ

আমি শুনতে পেয়েছিলাম, কিন্তু উত্তর দিতে পারি নি। আমার জীবন রক্ষার জন্য থেনডুপ লামাকে তাঁরা ধন্যবাদ জানালেন।

সেই ভয়ঙ্কর জায়গা থেকে নেমে এসে আমাদের একজন ঘোড়াওয়ালাকে আমি দেখতে পেলাম। আমার জন্য সে অপেক্ষা করছে। আমি তখন অনেক সুস্থ বোধ করছি। তাই তাকে এগিয়ে যেতে বললাম। পুরাণ্ড পর্যন্ত এই সাত মাইল প্রায় সমতল পথ আমি থেনডুপ লামার সঙ্গে হেঁটে যাব।

একজন অবাঙালী যাত্রী আমাকে একটু বিশ্রাম করতে বললেন। পকেট থেকে বার করে আখরোট কিসমিস আর বাদাম দিলেন খেতে। লামাকেও দিলেন। আর একজন তাঁর ফ্লাস্ক থেকে একটু চা ঢেলে দিলেন। এ আমাদের পথের পরিচয়, পথের আত্মীয়তা। পথ যত দুর্গম হবে, এই আত্মীয়তাও হবে তত নিবিড়।

আমি একখানা পাথরের উপরে বসলাম। লামা আমার পায়ের কাছে বসে জোর করে আমার পা টেনে নিল। টিপে টিপে গরম করে দিল ঠাণ্ডা পা দুখানা। আমি এই যুবক লামার মুখের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিলাম। মুখ তুলেই সে আমাকে দেখল। মিষ্টি হাসিতে ভরে গেল তার মুখখানা। সেই সুন্দর সরল হাসি। হাসলে থেনডুপ লামাকে ঠিক শিশুর মতো সরল মনে হয়।

তারপর আবার পথ চলা। এবারে থেনডুপ লামা আমার সঙ্গী হয়েছে। দুজনে আমরা পাশাপাশি পথ চলেছি।

এক সময় আমি বললাম : এবারে আপনার গল্পটা শেষ করুন।

লামা বলল : গল্পের তো শেষ এখনও হয় নি। যতটুকু হয়েছে, ততটুকুই বলতে পারি।

তারপরে আর একটি অধ্যায় শুনলাম থেনডুপ লামার মুখে।

তেরো

ব্যারাকে থেনডুপের পরিবর্তন হল অভাবনীয়। এখন আর তাকে চেনা যায় না। তার বিচিত্র পোশাকটা সে এখানে এসেই খুলে ফেলেছিল, সেটা স্টীমে কেচে এখন বাক্সে তুলে রেখেছে। এখন সেটার অন্য রকম ব্যবহার। সন্ধ্যাবেলায় ব্যারাকে যেদিন উৎসব হয়, তখন কোন দিন সেই পোশাক তাকে পরতে হয়। থেনডুপের গলা ভাল, গান গাইতেও জানে। সবাই তার গান শুনবে। বলবে, শুধু গান নয়, লামা সেজে নাচতেও হবে। তিব্বতী টং ডু ছেলে এখন দলে অনেক আছে। তারা কাড়ানাকাড়া করতাল আর ডামনিয়ে যোগাড় করে এনেছে। থেনডুপ তাদের বাজনার সঙ্গে লামা সেজে নাচে। সে এক রকমের অদ্ভুত আনন্দ।

থেনডুপ মোটর বাইক চালাতেও শিখেছে। আজ তার পিছনে বসেছে তাই ফুও। এক সময় সে পিছন থেকে চেঁচিয়ে বলল, কী ছিলে, আর কী হয়েছ!

মোটর বাইকের শব্দ কম নয়, তাইতেই জোরে বলা। থেনডুপ বলল, কী হয়েছি?

সত্যিই থেনডুপের পরিবর্তনটা বড় বিস্ময়ের। পোশাকে তো চিনবার উপায় নেই, চেহারাটাও যেন বদলে ফেলেছে। হঠাৎ দেখলে তাকে চীনা বলেই ভুল হয়। তাই ফুও সেই কথাই বলল, এবারে তো তোমার গ্রামে পৌঁছব, তোমার পুরনো বন্ধুদের জিজ্ঞেস ক'রো।

আমার আবার বন্ধু কোথায়!

কেন, তোমার লামা বন্ধুরা!

লামা শত্রুরা বল।

তাই ফুও সোল্লাসে বলল, লামারা তো সকলেরই শত্রু!

থেনডুপ বলল, গোম্ফায় পড়ে থাকলে আজ থেনডুপের ভূত এই মোটর বাইক চালাত।

তাই ফুঙ জিজ্ঞাসা করল, এখন তোমাকে দেখলেই ওরা কী করবে?

চিনতে পারবে না।

সত্যি!

শিতেন হয়তো চুপি চুপি বলবে, দেখতে ঠিক থেনডুপ লামার মতো। কিন্তু থেনডুপ যে একেবারে তোমাদের মতো হয়ে গেছে, তা ভাবতে পারবে না।

তাই ফুঙ আশ্চর্য হল, আর থেনডুপের মন হল নূতন ভাবনায় ভারাক্রান্ত। শিতেনের নামে তার ছ্যুতেনের কথা মনে পড়ল। ছ্যুতেন এখন কী করছে! সেই যে একদিন চার-পাঁচজন জোয়ান মানুষের গল্প শুনিয়েছিল, সে কি তাদের বিয়ে করেছে! না বোকার মতো তারই জন্যে অপেক্ষা করে আছে। ছ্যুতেনকে সে কোন দিন চিনতে পারে নি। ভিতরে ভিতরে মেয়েটা যে এমন জ্বলছিল, তা কি সে জানত! ঐ জোয়ান মানুষদের গল্পও তার কাছে মিথ্যা মনে হয়। এ সব হয়তো তার বানানো গল্প, তাকে ওস্কাবার জন্য বলত। তা না হলে অমন করে কি কেউ আক্রমণ করতে পারে! ভিতরে ভিতরে সে নিশ্চয়ই সমুদ্রের মতো গুমরে ছিল, তাইতেই অমন করে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। শৈশবে সে একবার জাংপো নদী দেখেছিল। সে অনেক দূরে। সবাই বলেছিল, সমুদ্র আরও অনেক দূরে। তার আরও অনেক জল, অনেক বড় ঢেউ। সে ঢেউ শুধু জলের উপরে নয়, মাটির উপরেও আছড়ে পড়ে। ছ্যুতেনকে সেদিন তার সমুদ্র বলে মনে হয়েছিল।

সামনের মোটর বাইকে যাচ্ছেন উ কিঙ। বয়সে ভারি হলেও তিনি রাশভারী নন। সকলের সঙ্গে সমান ভাবে মিশতে পারেন, হাসতে পারেন বেপরোয়া ভাবে, তেমনি বেপরোয়া ভাবে রসিকতা

করেন। ছেলেমেয়ের প্রভেদ তাঁর কাছে নেই, লজ্জা পেলে পালিয়ে বাঁচো। চিঙ লিঙ তাঁরই পিছনে পা ঝুলিয়ে বসেছে, আর মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে হাসছে।

সঙ্গে জিনিসপত্রের কোন অভাব নেই। স্টাফ স্ট্যাণ্ড থিওডোলাইট আছে, টিফিন বাস্কেটও আছে। সেই সমস্ত নিয়ে সামলে চলাও কঠিন ব্যাপার। অন্যমনস্ক হওয়া চলে না। হাসি-মস্করা করতে গেলে দুর্ঘটনা একটা ঘটবেই। তাই ফুঙ তবু চুপ করে চলতে রাজী নয়। বলল, একেবারে থেমে গেলে যে!

থেনডুপ বলল, না থেমে আর উপায় কী! যে রকম রাস্তা, তাতে দুটো চোখ যথেষ্ট নয়। মনটাকে দিয়ে তৃতীয় চোখের কাজ করাচ্ছি।

এ সবই তো তোমাদের পরিচিত রাস্তা।

পরিচিত বলেই আমরা পায়ে হাঁটি, নয় কোন নিরীহ জানোয়ারের পিঠে চেপে চলি। তোমাদের মতো অনধিকার চর্চা করি না।

তাই ফুঙ চেঁচিয়ে উঠল, অনধিকার চর্চা আবার কী!

এরই নাম অনধিকার চর্চা। পথ নেই, তবু ছোটো লাফিয়ে লাফিয়ে। দেখ চিঙ লিঙকে। তাই ফুঙ বলল, তুমি বুঝি এখন ওকেই দেখছ!

থেনডুপ বলল. দেখছি আর ভাবছি ঐ মেয়েদের কথা। শুধু হাসি-মস্করা নিয়ে থাকলে কি আর কাজ হয়! সবগুলো গিয়ে জুটেছে কালভার্টের নিচে, ও কালভার্ট কোন দিন শেষ হবে না।

তাই ফুঙ বলল, ব্যারাকে ফিরে এ কথা একবার ব'লো।

বলতে আমি ভয় পাই নাকি! এ দিকের জরিপ আমরা কবে শেষ করেছি বল। কেন তোমাদের বুলডোজারগুলো এগোতে পারছে না, ঐ কালভার্টের জন্যেই তো। বড় ট্রাকগুলো পার করতে পারলে আমাদের কাজ কত এগিয়ে যেত। এই অঞ্চলেই একটা আড্ডা করা যেত।

তাই ফুও বলল, আজ ব্যারাকে ফিরে আমি বড় সাহেবকে এই কথা বলব। তোমাকে যেন ঐ মেয়েদের কাজ দেখতে দেওয়া হয়।

রক্ষে কর। ঐ একটা মেয়েই যা জ্বালাচ্ছে, আমাকে আর অতগুলোর সঙ্গে ভিড়িও না। তাই ফুও প্রবল ভাবে হেসে উঠল। বলল, লামার এখনও মেয়েদের ভয় যায় নি।

তার পরেই বলল, কিন্তু সব লামা কি তোমার মতো! আমরা তো অন্য কথা শুনেছি।

কী কথা?

গ্রামের সব মেয়ের সঙ্গেই নাকি তাদের ভাব।

থেনডুপ বলল, আমাদের বড় লামাকে দেখ নি কি না, তাই এ কথা বলছ। তাকে দেখলে লামার সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা পালটে যেত।

সত্যি!

থেনডুপ উৎসাহ পেল। ঐ মানুষটির সম্বন্ধে তার শ্রদ্ধার অবধি নেই। অমন আর একটি মানুষের সাক্ষাৎ সে আজও পায় নি। উচ্ছ্বসিত ভাবে বলল, বড় লামার সব কথা তোমার বিশ্বাস হবে না। তোমরা এদিকে আসছ শুনে তিনি কী বলেছিলেন জান? বলেছিলেন, এ ভালই হল, দেশের লোক এবারে দু মুঠো খেতে পাবে। তোমাদের দলে যোগ দেবার জন্যে তিনি আমায় অনুমতি দিয়েছিলেন।

তাই ফুও বলল, তুমি কি তার কথাতেই গোম্ফা ছাড়লে?

থেনডুপ বলল, না।

তবে?

আমি নিজের ইচ্ছেয় ছেড়েছি।

হঠাৎ তোমার এমন ইচ্ছে কেন হল?

ইচ্ছা-অনিচ্ছার আবার কারণ কী? আজ যদি তোমাদের কাছে আমার ভাল না লাগে, তবে তোমাদেরও ছেড়ে যাব।

কাউকে তার কারণ বলে যাবে না ?

কাউকে না।

তাই ফুঙ চেঁচিয়ে বলল, বুঝেছি।

কী বুঝেছ ?

গোম্ফায় তুমি একটা গোলমাল করে এসেছ।

থেনডুপ এ কথার উত্তর দিল না।

তাই ফুঙ বলল, সে খুব অল্পস্বল্প গোলমাল নয়, লামাদের কাছে মুখ দেখান তোমার দায় হয়েছিল।

থেনডুপের সন্দেহ হল যে তাই ফুঙ বুঝি কিছু জানতে পেরেছে। তাদের পাশের গ্রামের একটা টং ডু ছেলে দলে এসেছে। বোধহয় তারই কাছে কিছু শুনেছে। তবু কোন উত্তর দিলে বিপদ বাড়বে মনে করে সে চুপ করে রইল।

তাই ফুঙ বলল, কেমন, ঠিক বলেছি তো !

থেনডুপ বিপদে পড়েছে। হ্যাঁ বলা চলে না, না বললেও মিথ্যা বলা হবে। তাই একটু ভেবে বলল, বলব না।

তাই ফুঙ হেসে উঠল। বলল, কেমন ধরেছি ! ডুবে ডুবে যে জল খাওয়া হত, সে সব আমরা জেনে ফেলেছি ! এবারে সেই মেয়েটার কী হল বল তো ?

কোন্ মেয়েটার ?

আরে ঐ তোমার সেই মেয়েটা। মনে পড়ছে না তাকে ?

ছ্যাতেনকে তার খুব মনে পড়ছে। কিন্তু এরা কি সত্যিই সব জেনে ফেলেছে নাকি ! যা সেয়ানা এই তাই ফুঙ ছেলেটা, কিছু বিচিত্র নয়। তবু সে কিছু স্বীকার করল না, বলল, তোমার সঙ্গে আর আমি বকতে পারছি না। এরই মধ্যে গলা শুকিয়ে উঠেছে।

তাই ফুঙ বলল, ভয় নেই, ফ্লাস্কে চা ভর্তি আছে।

থেনডুপ আর মুখ খুলল না। গন্তব্য স্থান পর্যন্ত একেবারে

নিঃশব্দে চলে এল। তাকে কথা বলাবার চেষ্টা করে বারে বারে তাই ফুঙ ব্যর্থ হল।

উ কিঙ যতক্ষণ কাজ করেন, ততক্ষণ কথা বলেন না একটাও। অন্যের কথা বলাও পছন্দ করেন না। বলেন, কাজের সময় কাজ। কিছু দিন আগেও এই জরিপের কাজ খুব বেশি লোকে জানত না। দলে দু-চারজন পাশকরা ইঞ্জিনীয়ার আর সার্ভেয়ার ছিল। এঁরই সঙ্গে কাজ করে আজ অনেকে জরিপ শিখেছে। থেনতুপ তো সেদিন এসেছে। প্রথমে স্টাফ ধরত, চেন টানত, এখন থিওডোলাইটে চোখ লাগায়, লেভেল বোঝে, নক্সাও বোঝে। তাই ফুঙ আর চিঙ লিঙ পাকা সার্ভেয়ার হয়েছে। তারা এখন নিজেরাই জরিপ করতে পারে।

হাতের কাজ শেষ হলেই উ কিঙের অন্য মূর্তি। একেবারে অন্য মানুষ হয়ে যান। মনে হবে না যে নানা বয়সের লোক আছে দলে। সবাই যেন সমবয়সী, সবাই বন্ধু। উদ্দাম ভাবে হাসবেন আর এমন বেয়াড়া রসিকতা করবেন যে সকলের কানে আঙুল দিতে ইচ্ছে হয়। তাঁর মুখ একবার আলগা হলে আর কারও রক্ষা নেই।

সকাল থেকে একটানা কাজ হয়েছে। এইবারে একটু বিশ্রামের দরকার। পকেট থেকে রুমাল বার করে উ কিঙ ঘাড়টা রগড়ে মুছলেন। তারপর চিঙ লিঙের দিকে তাকিয়ে বললেন, আর কেন, এবারে তোমার ভাণ্ডার-দ্বার খোল।

চিঙ লিঙ আর এক মুহূর্ত দেরি করল না, টিফিন বাস্কেট খোলবার জন্য দৌড়ে এগিয়ে গেল। সবাই জানে যে ইতস্তত করা মানেই কোন বিপদ ডাকা।

উ কিঙ তার এই তৎপরতা দেখে হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, অমন ছুটছিস কেন রে?

চিঙ লিঙ বলতে পারত, চায়ের জন্য, বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে

তোমাকে। কিন্তু সে কথা বলবারও সাহস সে পেল না। থেনছুপ হাসছিল, আর তাই ফুঙ চিঙ লিঙকে সাহায্য করবে কি না ভাবছিল। তাই ফুঙের দিকে চেয়ে উ কিঙ বললেন, তোর অমন দম আটকে আসছে কেন রে? তবু তো এখনও ঘরে তুলতে পারিস নি।

তাই ফুঙ বলল, কে বলল দম আটকাচ্ছে?

বলবে আবার কে। আমি নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি।

চিঙ লিঙ ততক্ষণে টিফিন বাস্কেট এনে সামনে হাজির করেছে। সেটাকে মাঝখানে রেখে সবাই ঘিরে বসল। উ কিঙ বললেন, তোরা আজকাল কবিতা পড়িস না কিনা, তাইতেই এমন আকাট হয়ে আছিস।

তাই ফুঙ বলল, আমরা তো কবিতা লিখি।

সে তো ইট কাঠ পাথরের কবিতা, বড় জোর লোহা লকড় আর টেলিগ্রাফের তার।

থেনছুপ হেসে উঠল।

উ কিঙ বললেন, তুই হাসিস নে। তোরা তো শুধু গোঁ গোঁ করে কাঁদতে জানিস।

চিঙ লিঙ এবারে হেসে উঠল, বলল, একেবারে খাঁটি কথা বলেছ উ কিঙদা, ওর গান মানেই গোঙানি।

আর তোর গান শুনলে কী মনে হয়?

থেনছুপ বলল, যেন গর্তের ভেতর থেকে ইঁদুর কাঁদছে।

উ কিঙ মাথা নেড়ে বললেন, আর ঐ ইঁদুরের কান্না শোনবার জন্যে—

তাই ফুঙ তাড়াতাড়ি বলল, তোমাদের সময় কবিতা কেমন ছিল উ কিঙদা?

কৌতুকের হাসি হেসে উ কিঙ বললেন, শুনবি?

পরম আগ্রহে থেনছুপ বলল, বল বল।

তুই আমাদের কবিতা কি বুঝবি রে যে অমন লাফাচ্ছিস!

চীনা ভাষা থেনডুপ আজকাল কিছু কিছু বোঝে, বলল, নিশ্চয় বুঝব।

উ কিঙ বললেন, মেয়ে ছাড়া আমাদের সময় কবিতা হত না, গান তো কিছুতেই না। তোমার ঐ মুখ আর তোমার ঐ…

বলে চিঙ লিঙের মুখের দিকে তাকাতেই সে আর্তনাদ করে উঠল, থাক থাক উ কিঙদা, তোমাকে আর বর্ণনা দিতে হবে না।

উ কিঙ হেসে বললেন, তোদের কোন রসজ্ঞান নেই বলেই সব কথাতে ভয় পাস। পাথর ভেঙে ভেঙে তোরা পাথরের মতো শুকনো হয়ে যাচ্ছিস। রসের ধারা যদি পাথরের নিচে হয়, তবেই সে রস, বাইরে বইলে বলে কাদা। তোদের কারবার আজকাল পাথর আর কাদা নিয়ে, রসের সন্ধান তোরা জানিস নে। আর তার উপর তোদের আদর্শের অভিমান যেমন গাঢ়, মনে হয় রসের আস্বাদ তোরা একেবারে ভুলেই যাবি।

উ কিঙ থামলেন না, বললেন, একটা কথা সত্যি করে বল্‌তো, সারা দিন এই খাটা-খাটুনির পর ড্রয়িং-টেবলে বসে তোদের নক্সা করতে ভাল লাগে, না অন্য কিছু ভাল লাগে?

তাই ফুঙের দিকে চেয়ে বললেন, এই মেয়েটার সঙ্গে একটু—

থেনডুপ বলে উঠল, একেবারে খাঁটি কথা বলেছ উ কিঙদা।

ওরে লামা, তোর পেটে এত বুদ্ধি! আমাদের কথায় যে সমানে তাল দিচ্ছিস!

তাই ফুঙ এবারে লাফিয়ে উঠল, বলল, জান উ কিঙদা, গোম্ফা থেকে এই থেনডুপ কেন পালিয়ে এসেছে!

থেনডুপ চেঁচিয়ে উঠল, মিথ্যে কথা।

মিথ্যে কথা! একটু আগে তুমি স্বীকার কর নি! পেরেছ প্রতিবাদ করতে!

চিঙ লিঙ বলে উঠল, বল কি লামা, শেষটায় তুমিও মিথ্যে কথা বলবে! বুদ্ধের ভক্ত হয়ে তোমার মুখে মিথ্যে কথা!

থেনডুপ বলল, বাজে কথায় বুদ্ধের নাম ক'রো না বলছি। আমি কখনও মিথ্যা বলি না।

উ কিঙ যে হাসছিলেন, থেনডুপ তা দেখতে পায় নি।

চিঙ লিঙ বলল, সত্য না বলাও মিথ্যার সামিল।

তোমাদের আমি ডরাই নাকি যে মিথ্যে বলব! ছ্যাতেন তো নিজেই এসেছিল।

তাই ফুঙ মাথা নেড়ে বলল, তবে গোলমালটা হল কেন?

চিঙ লিঙ খিলখিল করে হেসে উঠছিল, আর উ কিঙ হেসেছিলেন মুখ টিপে। থেনডুপও নিজের নির্বুদ্ধিতা বুঝতে পেরেছিল। তাই আর কোন কথা না বলে গভীর মনোযোগে রুটি কামড়াতে লাগল।

তাই ফুঙ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বলল, ছ্যাতেনের গল্পটা তাহলে বল।

থেনডুপ কোন উত্তর দিল না দেখে চিঙ লিঙ বলল, বল না লামা, লজ্জা কিসের।

থেনডুপ এ কথারও উত্তর দিল না।

উ কিঙ গম্ভীর ভাবে বললেন, ওদের তুই কিছুতেই বলিস নে, ওরা ভারি দুষ্টু। নিশ্চয়ই ওরা একটা ষড়যন্ত্র করে বেরিয়েছে।

আহত স্বরে থেনডুপ বলল, চা দাও।

ছ্যাতেনের গল্প না বললে তুমি চা পাবে না।

কৌতুকে ঝলমল করছিল চিঙ লিঙের মুখ।

থেনডুপ বলল, চাই নে চা, চল উ কিঙদা আমরা কাজ করি।

বলে উঠে দাঁড়াচ্ছিল। উ কিঙ তার হাত ধরে বসিয়ে দিলেন, বললেন, শোন্ তাহলে, সেই কবিতাটাই তোদের শোনাই।

কই আর বলছ!

বলে থেনডুপ তার গা ঘেঁষে বসল।

উ কিঙ হেসে বললেন, কবিতা কি আর বলার জিনিস, ও গাইতে হয়।

তিনজনেই এক সঙ্গে হাততালি দিয়ে উঠল, বলল, আজ তোমার গান শুনব।

পালাবি না তো?

— না—না—না।

তিনজনের তিনটে না শোনা গেল আলাদা আলাদা ভাবে।

তবে শোন্।

বলে উ কিঙ কাশলেন, গলা ঝাড়লেন, তারপর গাইলেন :

ওগো তোমার ভাণ্ডার দ্বার খোল।

সকৌতুকে এই কথাটি উ কিঙ মাঝে মাঝেই বলেন, চিঙ লিঙের বুক তাই ঢিপঢিপ করে উঠল।

উ কিঙ গাইছিলেন :

রুক্ষ তো নয় বক্ষ তোমার, সত্য কেন ভোল!

ওগো তোমার ভাণ্ডার দ্বার খোল।

তাই ফুঙ বাধা দেবে কি না ভাবছিল। তার আগেই উ কিঙ গাইলেন :

আমার পেটে ক্ষুধা

আর তোমার বুকে সুধা

ওগো তোমার শ্যামল আঁচল তোল।

চিঙ লিঙ চেঁচিয়ে উঠল, থাম থাম, আর গাইতে হবে না।

উ কিঙ ধমক দিলেন, তুর গাধা, সারা দিন তোরা নিজেদের কথাই ভাববি। তুই আমি ছাড়া কি ছুনিয়ায় আর কিছু নেই! বলে গাইতে লাগলেন :

তোমায় যখন বাঁধে

তখন কালো আকাশ কাঁদে,

ওগো তোমার খোলা বুকে সোনার ফসল হল।

মা আমার, মাটি আমার, তোমার ভাণ্ডার দ্বার খোল।

তিনজনেই হাততালি দিয়ে উন্মত্ত ভাবে চেঁচিয়ে উঠল। চিঙ লিঙ বলল, আবার গাও না উ কিঙদা, আমরাও শিখে নিই।

পয়সা ?

বলে উ কিঙ হাত বাড়ালেন।

থেনডুপ তার মাথাটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এই নাও, এটা তো পয়সার চেয়ে কম নয় !

উ কিঙ তাকে জড়িয়ে ধরে ঘড়ি দেখলেন। বললেন, আর তিন মিনিট। কাঁধে জোয়াল নেবার আগে প্রাণপণে চেঁচিয়ে নে।

সমস্বরে সবাই গেয়ে উঠল :

ওগো তোমার ভাণ্ডার দ্বার খোল।

সন্ধ্যাবেলায় খবর পাওয়া গেল যে বড় দপ্তর থেকে কড়া হুকুম এসেছে, শীত আসছে বলে আরও তাড়াতাড়ি আমাদের এগোতে হবে। শীত এখানে সাংঘাতিক। দক্ষিণ থেকে হাওয়া বয়, হিমালয়ের হিমেল হাওয়া। গা হাত পা ফেটে চৌচির হয়। মোটর বাইক চড়ে পথ চলা একেবার দুঃসাধ্য। তখন কাজের সময় কমাতে হয়। শুধু দুপুরবেলাতেই কাজ। আকাশে তখন অল্পক্ষণের জন্য সূর্য ওঠে।

উ কিঙ এসে থেনডুপের ঘরে ঢুকলেন। ডাকলেন, এই লামা !

সেজেগুজে থেনডুপ যাচ্ছিল খেলার ঘরে। চমকে গিয়ে বলল, কী উ কিঙদা ?

এদিকে আয়।

থেনডুপ এগিয়ে গেল।

উ কিঙ বললেন, সাহেবরা তোকে ডাকছে।

সন্ধ্যাবেলায় আবার সাহেবসুবো কেন !

মেয়েদের কোমর ধরে এখন নাচবি কিনা, সাহেবসুবো ভাল লাগবে কেন !

কী যা-তা বলছ!

ঠিকই বলছি। এককালে আমাদেরও তো বয়স ছিল, সন্ধ্যেবেলায় চাঁদের মুখ দেখতে কার না ভাল লাগে!

ওধার থেকে চিঙ লিঙ এসে বলল, ওকে নিয়ে আবার টানাটানি কেন করছ!

ভারি দরদ রে আমার! তাই ফুঙ কোথায়?

চিঙ লিঙ বুঝল যে আর কথা বললেই বিপদ। তাই জনকয়েক মেয়ের আড়ালে গিয়ে লুকলো।

চল আমার সঙ্গে।

বলে থেনতুপকে নিয়ে উ কিঙ এগিয়ে গেলেন।

ব্যারাক থেকে তাঁরা সোজা সুরকির রাস্তায় নামলেন, তারপর বড় অফিসের দিকে এগিয়ে চললেন। সেখানে ঘরে ঘরে তখনও আলো জ্বলছে। অনেক রাত পর্যন্ত তাঁরা কাজ করেন। না করে নাকি উপায় নেই। দিনের আলোয় মাঠেঘাটে কাজ দেখতে হয়। কাছেই একটা বড় পুল হচ্ছে। নড়বড়ে কাঠের পুলের উপর দিয়ে মানুষ পার হয়, ইয়াক মোটর বাইকও পেরোয়, কিন্তু ট্রাক এগোয় না। ঐ পুলটা শেষ হলেই এই ইউনিট চুয়াল্লিশ মাইল এগিয়ে যাবে। থেনতুপের গ্রাম পেরিয়ে এরা নতুন ঘর-বাড়ি তুলবে, তারপর ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত যাবে পৌঁছে। এই কাঠের পুলটা জোড়াতালি দিয়ে তারা এগোতে পারত। জোড়াতালি দেওয়া কাজ তারা পছন্দ করে না। দুদিন দেরি হয় হোক। কিন্তু কাজটা যেন ভাল হয়। যখন এগোবে তখন যেন সগৌরবে এগোতে পারে। সামনের চুয়াল্লিশ মাইলের মধ্যে আর কোন বড় বাধা নেই। ছোট ছোট কালভার্ট তৈরি হচ্ছে কয়েকটা। রাস্তার দুধারে বড় বড় পাথর ছিল, আর সিমেণ্ট গেছে মোটর বাইকে। অফিসের দিকে যেতে যেতে থেনতুপ বলল, হঠাৎ আমার ডাক পড়ল কেন?

জানি না, তবে অনুমান করা সোজা।

কোন গোলমাল হয়েছে নাকি উ কিঙদা ?

তা অত ভয় পাচ্ছিস কেন ! ওরা কি তোকে খেয়ে ফেলবে নাকি !

তা নয়, কিন্তু এমন করে আমাকে তো কোন দিন ডাকেন নি !

তাহলে এবারে চেঁচিয়ে কাঁদ্।

থেনত্নপ বলল, কাঁদছি কোথায় !

উ কিঙ বললেন, পুরুষমানুষের কান্না আবার কাকে বলে !

অফিসের কাছাকাছি পোঁছে থেনত্নপ বলল, বল না উ কিঙদা, আমার বড় ভয় করছে।

উ কিঙ বললেন, দূর হাবা, এবারে যে আমরা তোর গ্রামে যাব, সেখানে একটা গোম্ফা আছে বলেই কর্তাদের ভাবনা।

ভাবনা আবার কিসের ?

কিসের ভাবনা তা আমরা বুঝি। আমাদের যাতায়াতের পথে একটা গোম্ফা দেখেছিস তো, ওটা পেরবার সময় আমাদের গুলি চালাতে হয়েছিল।

থেনত্নপ আশ্চর্য হয়ে বলল, কেন ?

অনুরোধে পথ ছেড়ে না দিলেই গোলমাল বাধে। শুধু নিজেরাই বাধা দিচ্ছে না, দেশের লোকদেরও ক্ষেপাচ্ছে। বলছে যে চীনারা দেশের সর্বনাশ করতে এসেছে। দেশের নিরীহ লোকদের কাছে এ কথা প্রমাণ করবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। তুই তো জানিস সব কথা।

থেনত্নপ গম্ভীর ভাবে বলল, হুঁ।

হুঁ কিরে, দেখিস নি নিজের চোখে !

থেনত্নপ এ কথার উত্তর দিতে পারল না। তার বুকের ভিতর কেমন একটা বেদনা বোধ হল। অদ্ভুত একটা যন্ত্রণা। ইচ্ছা হল যে বুকের উপর একটা হাত চেপে বসে পড়ে। কিন্তু তার উপায় নেই। পাশে উ কিঙ, আর সামনে অফিস।

উ কিঙ তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, কিরে, কী হল তোর ?

কই, কিছু না তো !

কিছু না বললেই হল ! তোর মুখ দেখে আমি বুঝতে পারছি।

থেনডুপ ভয়ে ভয়ে বলল, আমায় কী করতে বলবে উ কিঙদা ?

কী আর বলবে, পথঘাট দেখিয়ে দিবি, চিনিয়ে দিবি তোর আত্মীয় বন্ধুদের। তোর মতো তাঁরাও আমাদের সাহায্য করবেন, এই অনুরোধ করা হবে।

এমন তাচ্ছিল্যের সুরে উ কিঙ এই কথা বললেন যে পরিবেশটা অনেক সহজ হয়ে গেল। কিন্তু থেনডুপের ভয় একেবারে গেল না। অফিসের বারান্দায় উঠেও থেনডুপের মনে হল যে, চারিদিকটা তার বুকের মতোই থমথম করছে। উৎসবের দিনে তাদের গোম্ফায় উপাসনার ঘরও এমনি থমথম করে। কিন্তু থেনডুপের সেখানে ভয় করত না।

এখানে উ কিঙের ভয়ডর কিছু নেই। থেনডুপকে নিয়ে বড় সাহেবের ঘরে ঢুকে গেলেন। সেখানে তিনি একা ছিলেন না, আরও কয়েকজন তাঁর সামনে বসেছিল। বড় সাহেব তাদেরও বসতে বললেন।

বসবার আগে উ কিঙ বললেন, এরই নাম থেনডুপ

বড় সাহেব হাত বাড়িয়ে তার সঙ্গে করমর্দন করলেন, বললেন, খুশী হলাম তোমাকে দেখে।

তারপরে তারা বসবার পর কাজের কথা বললেন, তোমাদের গ্রামে তোমার বন্ধু কে কে আছেন থেনডুপ ?

বন্ধু ! থেনডুপ ভাবনায় পড়ল। তার আবার বন্ধু কে আছে ! বন্ধু তো সব এইখানেই। থেনডুপের কান দুটো গরম হয়ে উঠল।

বড় সাহেব বললেন, গোম্ফার ভিতরে।

গোম্ফার ভিতরে ? গোম্ফার ভিতরে তো এক বড় লামা তাকে ভালবাসেন, আর ঐ শিতেন। অনেক ভেবেচিন্তে থেনডুপ এই দুজনেরই নাম করল।

আর কেউ ?

আর তো কেউ আমাকে ভালবাসতেন না। ওয়াঙচুক লামা ফুরপা লামা এঁরা তো—

থেনডুপ থামতেই বড় সাহেব বললেন, বল।

থেনডুপ বলল, গোম্ফা ছেড়ে আমি চলে আসতে তাঁরা বোধহয় খুশী হয়েছেন।

কেন বল তো ?

বড় লামা নাকি আমাকে তাঁর গদিতে বসাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সত্যি বলছি, আমি কোন দিন তা চাই নি।

বড় সাহেব এর বেশি আর কিছু জানতে চাইলেন না, বললেন, গোম্ফার বাইরে তোমার বন্ধু নেই ?

গোম্ফার বাইরে! থেনডুপ ভাবতে লাগল। তার নিজের পরিবারের তো কেউ তাকে চায় না! যে চায় সে একটা মেয়ে। তার নাম করলে এঁরা কী ভাববেন!

উ কিঙ বললেন, ছ্যাতেনের নাম বললি না ?

লজ্জা পেয়ে থেনডুপ বলল, ও তো একটা মেয়ে!

একজন অপরিচিত সাহেব বললেন, মেয়ে হলেও মানুষ তো!

বড় সাহেব বললেন, গোম্ফায় তোমরা আমাদের খবর পেয়েছিলে ?

পেয়েছিলাম স্যার।

কী ঠিক করেছিলে ?

আমি বলেছিলাম, এ ভাল হল, দেশের লোকের উপকার হবে বড় লামাও তাই বলেছিলেন। কিন্তু সে কথা আর কেউ মানে নি। তখন পেম লামাকে ডাকা হয়েছিল। তাঁর উপরে বুদ্ধের ভর হয়। তিনিও বলেছিলেন, এ ভালই হবে।

তারপরে সবাই সে কথা মেনে নিয়েছে ?

তা জানি নে। সেই দিনই আমি গোম্ফা ছেড়ে চলে এসেছিলাম।

থেনডুপ ভেবেছিল যে এইবারে হয়তো বড় সাহেব তার গোম্ফা

ছাড়ার কারণ জানতে চাইবেন। কিন্তু তা চাইলেন না বলে সে আশ্চর্য হল। বড় সাহেব বললেন, আমাদের এই খবরের দরকার ছিল।

উ কিঙ জিজ্ঞাসা করলেন, পারবি এই খবর আনতে?

বড় সাহেব বাধা দিয়ে বললেন, না না, সেখানে গিয়ে ওর কাজ নেই।

ভয়! থেনডুপ ভাবল, বড় সাহেব কি ভয় পাচ্ছেন তাকে সেখানে যেতে দিতে! বড় সাহেব এক মুহূর্ত ভাবলেন, তারপর বললেন, আচ্ছা, তোমরা এস।

থেনডুপ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বড় সাহেবকে নমস্কার করে উ কিঙের সঙ্গে বেরিয়ে এল তাড়াতাড়ি।

পথে উ কিঙ জিজ্ঞাসা করলেন, কী ভাবছিস?

থেনডুপ বলল, আমি ভেবেছিলাম, ওঁরা আরও অনেক কিছু বলতে চাইবেন, হয়তো বা কাজেরও ভার দেবেন কিছু।

উ কিঙ বললেন, ওঁরা সবই জানেন। দেখিস নি, তুই ঘরে ঢুকতেই বড় সাহেব তাঁর টেপ রেকর্ডার চালিয়ে দিয়েছিলেন! পরে সেটা বাজিয়ে দেখে অনেক কিছু বুঝতে পারবেন।

থেনডুপ আশ্চর্য হল, বলল, কিন্তু আমায় জিজ্ঞেস করলে তো আমি সব কথাই বলতাম।

তুই একটা গাধা। তুই যা বলবি, সে সব তো ওঁর জানা কথা। তুই যা জানিস নে, তাও উনি জানেন। থেনডুপ তার দু চোখ বিস্ফারিত করে উ কিঙের দিকে তাকাল।

উ কিঙ বললেন, তা না জানলে তোকে সেখানে পাঠাতে চাইলেন না কেন!

ভয়ে ভয়ে থেনডুপ বলল, লামারা আমাকে মেরে ফেলতে পারে। ওরা নাকি আমাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছিল।

উ কিঙ বললেন, সেই ভয়েই তো পালিয়ে এসেছিস।

থেনডুপ এ কথার প্রতিবাদ করল না। প্রতিবাদ করলেই ছ্যাতেনের কথা উঠে পড়বে।

চোদ্দ

বন্ধুর অসমতল পথে সতর্ক ভাবে পথ চলতে হয়, কষ্ট হয় কথা বলতে। থেনতুপ লামা অনেক ধীরে ধীরে অনেক বিশ্রাম নিয়ে তার জীবনের কাহিনী আমাকে শোনাচ্ছিল। কিন্তু আজকের কথায় আমি কোন আকর্ষণ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এ যেন একটা গতানুগতিক জীবনের কথা, উদ্দেশ্যহীন যান্ত্রিক জীবন, তার জন্য সর্বসাধারণের কোন কৌতূহল নেই। আমার মনে হচ্ছিল যে থেনতুপ লামা কোন ভয়ঙ্কর ঘটনা বলবার জন্য তার মনকে তৈরি করছিল। যে ঘটনা তার জীবনের প্রবাহকে ঘুরিয়ে দিয়েছে, সেই ঘটনা নিশ্চয়ই মর্মান্তিক। কিন্তু ঝপ করে তা বলা যায় না, জোর করে বলতে গেলে হৃদয় থেকে রক্তক্ষরণ শুরু হবে।

মহাকবি সেক্সপীয়রের কথা আমার মনে পড়ল। হ্যামলেট নাটকের শেষ অঙ্কে আমরা সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের জন্য যখন অপেক্ষা করছি, সেই সময় গ্রেভ ডিগারদের দৃশ্য এল। দীর্ঘ অবান্তর দৃশ্য বিরক্তিকর। অনেকে বলেন, সেক্সপীয়রের এ দুর্বলতা। কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে এই দুর্বলতা তাঁর ইচ্ছাকৃত। তিনি তাঁর দর্শকদের সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করবার জন্য শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ দিয়েছেন। থেনতুপ লামার বেলাতেও আমার এই কথা মনে হল। সেও কিন্তু অপ্রয়োজনীয় কথা বলে নিজের মনকে শক্ত করল।

লামা অনেকক্ষণ থেকে কোন কথা বলছিল না। তাই দেখে আমি বললাম: তারপর?

তারপর!

অন্যমনস্ক ভাবে পথ চলতে চলতে লামা বলল: তারপর আমার সুখের স্বপ্ন ভেঙে গেল। বুঝতে পারলাম যে জীবন আমার চিরদিনের মতো ব্যর্থ হয়ে গেল।

কেন ?

যা শুনেছিলাম তা ভুল, যা জেনেছিলাম তা ভুল, যা দেখেছিলাম তাও ভুল। যেদিন এই ভুল আমি বুঝতে পেরেছিলাম, সেদিন আমার আত্মহত্যা করে মরা উচিত ছিল। কিন্তু তা পারলাম না। মনে হল যে আমার এই পরাজয় বুদ্ধ ক্ষমা করবেন না। অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে আমাকে মরতে হবে।

থেনডুপ লামার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তার মুখে এখন সে হাসি আর নেই। একটা অবরুদ্ধ কান্নায় তার ছু চোখ থমথম করছে।

অনেকক্ষণ পরে সে বলল, চীনারা আমাদের ঠকিয়েছে, দেশ-ছাড়া করেছে আমাদের। সেদিন আমরা তাদের স্তোকবাক্যে ভুলে বন্ধু বলে তাদের মেনে নিয়েছিলাম।

স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই যে এদের কাহিনী আমার জানা নেই। এদের সম্বন্ধে কোন কৌতূহল ছিল না বলেই আমি কিছু জানবার চেষ্টা করি নি। এখনও করি না। থেনডুপ লামা তাঁর দেশ সম্বন্ধে সত্য বলেছে না মিথ্যা, আমার কাছে তা বড় নয়। আমার কাছে বড হয়ে উঠেছে তার নিজের জীবনের কথা, তার নিজের বিশ্বাসের কথা। সে নিজে প্রতারিত হয়েছে, সেই প্রতারণার গ্লানি আজও তাকে অপরিসীম পীড়া দিচ্ছে। আমি তাকে কোন সান্ত্বনা দিতে পারলাম না। আমার মনও হল ভারাক্রান্ত।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে চলবার পরে থেনডুপ লামা বলল : আপনি তো এখন বেশ সুস্থ বোধ করছেন, এবারে আমি একটু তাড়াতাড়ি চলি .

সত্যিই তো, দুর্ঘটনার কথা আমি বেমালুম ভুলে গেছি। আমার আর কোন কষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু লামা কেন হঠাৎ বিদায় নিতে চাইছে! আমি একবার পিছন ফিরে তাকালাম, আর একবার তাকালাম সামনের দিকে। এ পথে চড়াই উৎরাই বেশি নেই,

তাই অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করা যায়। হঠাৎ মনে হল যে সামনে একটা পাথরের আড়ালে দুজন মানুষ দেখা গেল। আর খানিকটা তফাতে দুটো ঘোড়া মাটিতে মুখ দিয়ে কিছু খাচ্ছে। তারপরেই দেখলাম, বড় বড় পা ফেলে থেনডুপ লামা অনেকটা পথ এগিয়ে গেছে। ইচ্ছা হল, তাকে চীৎকার করে ডাকি। বলি, আমাকে ফেলে এগিয়ে যাবেন না, আর আপনার বাকি গল্পটা যান শেষ করে। কিন্তু তা পারলাম না। তার আগেই পথের পাশ থেকে একজন বলে উঠল: বন্ধু পালিয়ে গেল!

আমি থমকে দাঁড়ালাম। এ তো মায়া ধীরের গলা। তার পাশ থেকে মিস্টার ধীরও এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন: পথে কী বিপদ হয়েছিল শুনলাম!

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম: কার কাছে শুনলেন?

সে কথা বড় নয়, বড় হচ্ছে এই সংবাদটা সত্য কি না।

সেটাও আর বড় নয়। জীবনে বিপদ আপদ অনেক আসে, তা মেনে না নিয়ে উপায় নেই।

মায়া ধীর খিলখিল করে হেসে উঠল।

আমি বললাম: হাসি কেন?

মিস্টার ধীর বললেন: ওর জিত হল। বলেছিল, আপনাকে প্রশ্ন করে কোন উত্তর পাওয়া যাবে না।

বললাম: তবে আপনি স্বেচ্ছায় হেরেছেন।

কেন?

আমার নিজের প্রশ্নের উত্তর পেলে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য হতাম।

মিস্টার ধীর এ কথা মেনে নিয়ে বললেন: একজন বাঙালী যাত্রী সবাইকে বলছেন যে বরফের ভিতর আপনি ডুবে গিয়েছিলেন। মানে, আর—

বুঝেছি, বেরিয়ে আসবার উপায় ছিল না, জীবন্ত সমাধি হয়ে যাচ্ছিল। কী করে রক্ষা পেলাম, তাও নিশ্চয়ই বলেছেন ?

মায়া ধীর গম্ভীর মুখে বলল : উপর থেকে ভগবান বুদ্ধ আপনাকে দেখছিলেন, তিনি আপনাকে লামার রূপ ধরে হাত বাড়িয়ে বরফের নিচে থেকে টেনে তুললেন। কিন্তু আপনাদের দেখে ভগবান বুদ্ধ যে পালিয়ে গেলেন।

আপনারা পাপী কিনা, তাই।

সত্যিই থেনতুপ লামা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। কী শক্তসমর্থ তার পথ চলা, যেন বাঁধানো সড়কের উপর দিয়ে পল্টন চলেছে মার্চ করে।

মিস্টার ধীর বললেন : ভদ্রলোক সবার কাছে এই সংবাদ ঘোষণা করতে করতে দ্রুত এগিয়ে চলেছেন। ভয় পেয়ে আমরা আর এগোলাম না, সত্যি ঘটনা জানবার জন্যে আমরা অপেক্ষা করছিলাম।

সত্যি ঘটনা আমি তাঁদের সংক্ষেপে বললাম। এ কথাও স্বীকার করলাম যে ঐ লামা না থাকলে আমার জীবন সত্যিই বিপন্ন হত। এক হাঁটু বরফের নিচে থেকে পা দুখানা টেনে বার করতে পারতাম কিনা জানি না।

মায়ার মুখে উদ্বেগ ছিল, তবু বলল : এ আপনার একটা অতিরিক্ত অভিজ্ঞতা হল।

তারপর আমরা আবার চলতে শুরু করলাম। মিস্টার ধীর আমাকে ঘোড়ায় চড়বার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু আমি রাজী হই নি। হাঁটতেই আমার ভাল লাগছে। তাতে আরাম এইটুকু যে দেহে কোন ব্যথা হয় না। পায়ের ব্যথা বেশিক্ষণ থাকে না।

চলতে চলতে মায়া বলল : লামা বোধহয় আমাদের চিনতে পেয়েছিল। তাই পালিয়ে গেল।

আমি বললাম : তাতে সন্দেহ নেই।

মিস্টার ধীর বললেন : আমরা তো পোশাকের পুঁটুলি, দূর থেকে আমাদের চিনল কী করে তাই ভাবি।

আপনাকে চেনে নি, চিনেছে মিস ধীরকে। ঘরপোড়া গরু কিনা, তাই সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়।

এই কথাটি আমি আগে কখনও বলেছি কিনা মনে ছিল না। মায়া বলল : এ আপনার একটি প্রিয় মন্তব্য দেখতে পাচ্ছি।

উত্তরে আমি বললাম : সত্যি কথা মানুষের প্রিয় কথা। বারে বারে বললেও মনে হয় না যে আগে কখনও বলেছি। রাম নামের মাহাত্ম্য শোনেন নি! রাম নাম করেই তুলসীদাস তাঁর সারা জীবন কাটিয়ে দিলেন, বুঝতেই পারলেন না যে রাম নাম ছাড়া আর কিছু তিনি কখনও বলেন নি।

গম্ভীর ভাবে মায়া বলল : আপনি ক্রমেই মিস্টিরিয়াস হয়ে উঠছেন।

আমি এ কথার প্রতিবাদ করলাম না।

আমরা একটি ঝর্ণার ধারে ধারে এগোচ্ছিলাম। এই ঝর্ণাটিই ধীরে ধীরে প্রশস্ত হয়ে নদীর মতো দেখাচ্ছিল। এই রকমের অনেকগুলি ঝর্ণার ধারা গিয়ে বর্ণালী নদীতে মিশেছে। বর্ণালীর তিব্বতী নাম মাব চু। চু মানে জল। পুরাঙ গ্রাম এই নদীরই দুই তীরে বিস্তৃত। পুরাঙকে ভারতীয়েরা তাকলাখার বা তাকলাকোট বলে। ভারতের সীমান্তের কাছে এই তিব্বতী জনপদে ভারতের সঙ্গেই তিব্বতের ব্যবসা। নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের বিনিময়।

আমরা যে পুরাঙের নিকটবর্তী হচ্ছি তা বুঝতে পারছিলাম এক বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র দেখে। গম আর যবের চাষ হয়েছে। কড়াই-শুঁটির চাষও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এ সব আমাদের রবিশস্য, শীতকালে হয়। কিন্তু হিমালয়ের পরপারে দেখেছি যে বর্ষাতেই

এ সবের চাষ হচ্ছে। তিব্বতের এখন কোন্‌ ঋতু তা জানি নে। অনেক আগেই আমরা কালো চশমা লাগিয়েছি চোখে। রৌদ্র বড় তীব্র, বাতাস শুষ্ক। মনে হচ্ছে, শুকনো ঠোঁট ফাটতে শুরু করেছে, নিয়মিত ক্রীম ব্যবহার না করলে হাত পা মুখও ফাটবে।

দূর থেকেই আমরা গ্রামখানি দেখতে পাচ্ছি। পাহাড়ের উপরে একটা প্রাচীন দুর্গ, সেখানে থাকেন স্থানীয় শাসনকর্তা জুম্পান পুসো। পুরনো একটি গোম্ফাও আছে, আর নানা বর্ণের কিছু ঘর-বাড়ি। এই জায়গারই নাম পুরাঙ। নীচে নদীর ধারের সমতল ভূমির উপরে যে বাজার, তার নাম তাকলাখার মণ্ডি। বর্ণালী নদী এখানে বেঁকে পূর্ব দিক ঘুরে আবার দক্ষিণে প্রবাহিত হচ্ছে, নেপাল রাজ্যের ভিতর দিয়ে এসেছে ভারতবর্ষে। এই নদীর ধারে নাকি আর একটি তীর্থস্থান আছে, তার নাম কোদণ্ডনাথ, এদেশের ভাষায় বলে কোজর যো। পরে এই তীর্থের কথা আমরা সবিস্তারে শুনেছিলাম।

নদীর বুক প্রায় আধ মাইল বিস্তৃত। কিন্তু জল নেই সবখানে। কাঠের পুলের উপর দিয়ে জল পেরিয়ে নদীর তীরেই আমরা রাত কাটাবার আয়োজন করলাম। কিন্তু তাঁবু খাটানো একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠল। বাতাসের জন্যে তাঁবু তোলা যায় না, যদি বা উঠল তো খুঁটি আলগা হয়ে গেল। পাথর ও বালির মধ্যে খুঁটি কিছুতেই শক্ত হবে না। ভারী পাথর চাপা দিয়ে সেই খুঁটি শক্ত করতে হল।

আমরা এখন পুরোপুরি ভাবে তিব্বতের মধ্যে এসে পড়েছি। তিব্বতের গ্রাম, তিব্বতের বাজার, মানুষজনও সব তিব্বতী। ভারতবর্ষ থেকে ভুটিয়া ব্যবসাদারেরা এসেছে, তারা এখানে বিদেশী, আমরা তীর্থযাত্রীর দলও বিদেশী। তবে তিব্বতীরা আমাদের শান্তিপ্রিয় প্রতিবেশী ভাবে, আমাদের বেলায় তাদের আইন কানুনের কড়াকড়ি নেই। সে সাহেবদের বেলায়। সাহেবদের তারা ভয়

করে। সন্দেহের চোখে দেখে। মাথায় টুপি থাকলে তা এখানে খুলে ফেলা দরকার। পাহাড়ী টুপি বা পাগড়ি দেখলে এদের দুশ্চিন্তা হয় না। গার্বিয়াঙ থেকে আমাদের যে সব ঘোড়া ও ঝব্বু এসেছে, এইখানে তাদের ভাড়া আমাদের মিটিয়ে দিতে হল। এখান থেকে আমাদের তিব্বতী জানোয়ার নিতে হবে। তারা আমাদের সঙ্গে মানস সরোবর ও কৈলাস ঘুরে এখানে ফিরবে। এখান থেকে আবার ভারতীয় জানোয়ার নিয়ে গার্বিয়াঙ যেতে হবে।

আমাদের দোভাষীকে তারা জিজ্ঞাসা করল, মানস সরোবর দেখে কৈলাস পরিক্রমা করে ফিরতে আমাদের কত দিন লাগবে?

দোভাষী বলল : কৈলাস এখান থেকে চার দিনের পথ, পরিক্রমা করে ফিরতে আমাদের দশ-এগারো দিন লাগবে।

এই দোভাষীর কাছেই আমরা কোদণ্ডনাথ ও কোজর যোর কথা শুনলাম। কেউ বলেন খোজরনাথ, হিন্দুর তীর্থ। মাঝখানে বিষ্ণু, দু পাশে লক্ষ্মী-সরস্বতীর ধাতব মূর্তি। অপরূপ সুন্দর। চোখ ফেরানো যায় না। কালী নদীর তীরে দশ-এগারো মাইল প্রায় সমতল পথ ধরে গেলেই এই কোজর যো। গোম্ফার মতো দেখতে, আর লামারা এই মন্দির রক্ষা করছেন।

দোভাষী বলল : কাল যদি কৈলাসের পথে যাত্রা না করেন, তবে এক দিনেই সেখান থেকে ঘুরে আসা যায়।

মিস্টার ধীর বললেন : এক দিনে বাইশ মাইল পথ!

দোভাষী বলল : ঘোড়ায় যেতে হয়। সকালে বেরিয়ে সন্ধ্যাবেলায় ফেরা। হেঁটে গেলে কোজর যোতেই রাত্রি বাস করতে হবে।

মিস্টার মাথুর বললেন : দেশে আমরা অনেক মন্দির দেখেছি. অনেক সুন্দর দেবদেবীর মূর্তি। যা দেখবার জন্যে এদিকে এসেছি, তাই দেখেই ফিরব।

সাহস করে দোভাষী বলল : কৈলাস যাত্রীরা সবাই কোজর যো দেখে যান।

মিসেস ধীর বললেন : আমাদের আর শক্তি নেই।

মিস্টার ধীর বললেন : দ্রষ্টব্য বস্তু হলে দেখতে হবে বৈকি। অন্তত একখানা ছবি নেবার জন্যেই যেতে হবে।

মিস্টার ধীর এই দুর্গম পথের অনেক মূল্যবান ছবি নিয়েছেন। আমাদের অজ্ঞাতসারে লামার সঙ্গে আমার ছবিও নাকি নিয়েছেন। কোথাও সাধারণ ক্যামেরার ছবি নিয়েছেন একটি দৃশ্যের, কোথাও চলচ্চিত্র। যখন আমার দুর্ঘটনার জন্য আপসোস করেছিলেন, তখন তাঁর বেশি আপসোস হয়েছিল ছবি তুলতে পারেন নি বলে। এ রকম একটা দুর্ঘটনা ঘটবে জানলে তিনি সারাক্ষণ নাকি সেইখানেই বসে থাকতেন। মায়া বলেছিল, সে শখ থাকলে আশা নিয়ে বসে থাকতে হত। আমি বলেছিলাম, আশা নয়। আশঙ্কা।

মিস্টার ধীরকে উৎসাহ দিলেন মিসেস মাথুর। বললেন : দরকার মনে করলে ওঁরা এইখানেই বিশ্রাম করতে পারেন, আমরা ঘুরে আসব।

আমি বললাম : এখন থাক, কৈলাস থেকে ফেরার পথে আমরা ভেবে দেখব।

মায়া আমাকে সমর্থন করে বলল : সেই ভাল।

মিস্টার ধীর এ কথা মেনে নিতেই মিস্টার মাথুর ও মিসেস ধীর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

পনেরো

দোভাষীর কাছে আমরা পুরাঙের ঐতিহাসিক গৌরবের কাহিনী শুনলাম। পুরাঙের জুম্পান পুসো কী রকম বীরত্বের সঙ্গে এই দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করেছিলেন, সেই কাহিনী। জারোয়ার সিং ছিলেন কাশ্মীরের মহারাজা বনবীর সিংহের দুর্ধর্ষ সেনাপতি। জাস্কর বালতিস্থান লাদাখ জয় করে তিনি ভাবলেন যে তিব্বতের এই অঞ্চলটাও জয় করবেন। ছ হাজার সৈন্য নিয়ে তিনি পুরাঙের দিকে অগ্রসর হলেন। সময় মতো খবর পেয়ে গেলেন পুরাঙের জুম্পান পুসো। তিনি লাসা থেকে চীনা সৈন্য চেয়ে আনলেন। আর নিজের সৈন্যও সংগ্রহ করে দুর্গের ভিতর অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এদিকে শীত পড়তে আরম্ভ করেছে। খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে জারোয়ার সিংহের সৈন্যদের মধ্যে। দেশ থেকে রসদ আসছে না, এই গরীব দেশে ছ হাজার সৈন্যের রসদ সংগ্রহ করাও সম্ভব নয়। সবাই ফিরতে চাইল, কিন্তু জারোয়ার সিং বললেন, না। ফিরতেও তো রসদের দরকার, বরং পুরাঙ দখল করে রসদ সেইখানেই সংগ্রহ করব। কাজেই এই দুর্গম পার্বত্য-পথে কাশ্মীর রাজের সেনাবাহিনী ধীরে ধীরে অগ্রসর হল। শীতে অর্ধাহারে অব্যবস্থায় সৈন্যদের আর কষ্টের সীমা রইল না। কিন্তু কোন উপায় নেই, সেনাপতির হুকুমে এগোতেই হবে।

প্রথমে তাঁরা তীর্থপুরীর দিকে গিয়েছিলেন, সেখানে শত্রু-সৈন্যের দেখা না পেয়ে পুরাঙের দিকে ফিরলেন। জারোয়ার সিং প্রথমে চার শো সৈন্য পাঠালেন। সেই শীতার্ত ক্ষুধার্ত সৈন্য জুম্পান পুসোর সৈন্যের হাতে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হল। তারপর জারোয়ার সিং দুশো সৈন্য পাঠালেন, তাদেরও হল একই অবস্থা। তারপর তিনি সমস্ত সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করলেন। কিন্তু যুদ্ধ করবে কারা! দুর্বল অশক্ত অসহায় কতগুলো মানুষ! ক্ষুধার্ত মানুষ বুঝি শীতে বেশি

কষ্ট পায়। রাত্রে তাই সৈন্যরা তরোয়ালের খাপ পুড়িয়ে গরম থাকবার চেষ্টা করল। কিন্তু কোন ফল হল না। সকালবেলায় তিব্বতী ও চীনা সৈন্যের হাতে তারা পরাজিত ও নিহত হল। যুদ্ধক্ষেত্রে জারোয়ার সিং সৈন্যদলকে অনেক উৎসাহ দিয়েছিলেন, নিজে যুদ্ধ করেছিলেন অমিতবিক্রমে। তাঁর মৃত্যুতেই সব ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। জারোয়ার সিংহের ছিন্নমুণ্ড পুরাঙের জুম্পান পুসো লাসায় পাঠিয়ে দিলেন।

দোভাষী বলল: এই যুদ্ধজয়ের কাহিনী পুরাঙের ঘরে ঘরে প্রচলিত আছে। এর জন্যে আজও এরা গর্ব অনুভব করে।

কাশ্মীরে এই জারোয়ার সিংহের কথা শুনেছি বলে মনে পড়ল না। পরাজিত ও নিহত সেনাপতির কথা তারা হয়তো ভুলে গেছে। কিংবা আমরাই সেই বীরের কথা জানবার কোন চেষ্টা করি নি। এ দেশেও কোন বীরের নাম শুনলাম না, শুনলাম জনসাধারণের মনোবলের ও বীরত্বের কথা, বিদেশী শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে কী করে রক্ষা করেছিল সেই কথা। পুরাঙের অলিখিত ইতিহাসে এই একটিমাত্র যুদ্ধের কথা পুরুষানুক্রমে চলে আসছে।

আমি এর পরবর্তী কালের কথা ভাবছিলাম, একেবারে সাম্প্রতিক কালের কথা। এ-অঞ্চলে কি কোনও রক্তপাত হয় নি। আর ঐ গোম্ফার লামারা কি কোন বিদেশীকে বাধা দেবার চেষ্টা করে নি! থেনড়ুপ লামার কথা আমার মনে পড়ল। ওরাও তো একটা পাহাড়ের উপর ঐ রকমের একটা গোম্ফায় বাস করত। হয়তো পুরাঙের মতো উঁচু পাহাড়ের উপরে নয়, কিন্তু সেই নামগিয়েল গোম্ফাও একটা ছোট পাহাড়ের উপরে ছিল। নিচে থেকে হয়তো এই রকমই দেখাতো সেই গোম্ফাটি।

নদীর ধারে একখণ্ড পাথরে বসে আমি পাহাড়ের দিকে চেয়েছিলাম। উপরের বাড়ি ঘরগুলি খুব ছোট ছোট দেখা যাচ্ছে। এরই মধ্যে একটা দুর্গ আর একটা গোম্ফা, দোভাষীর মুখে তার নাম

শুনেছি শিমপি লীঙ গোম্ফা। এ সব গোম্ফা অনেক প্রাচীন, অনেক দিনের অনেক সম্পদ ও স্মৃতিকে জড়িয়ে এখনও এই তীর্থস্থানগুলি অগণিত নর-নারীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছে। বুকে এক রকমের অদ্ভুত বিস্ময় নিয়ে আমি ঐ পাহাড়ের দিকে তাকিয়েছিলাম।

মায়া কখন এসে আমার পাশে বসেছিল আমি দেখতে পাই নি। ঝড়ের মতো একটা বাতাস সারাক্ষণ বইছে। শুকনো রুক্ষ বাতাসে দেহের অনাবৃত স্থান শুকিয়ে ওঠে, যত্ন না নিলে ফেটে রক্ত বেরোয়। সূর্যের আলোতেও এমন একটা উত্তাপ আছে যে চোখ জ্বালা করে, কিন্তু দেহের শীত কমে না। রৌদ্র ও বাতাসের এ-অভিজ্ঞতা আমাদের দেশে কখনও হয় নি।

আমি ভাবছিলাম পুরাণের শিমপি লীঙ গোম্ফা দেখতে যাবার কথা। একজন সঙ্গী পেলে উৎসাহ পেতাম ঐ পাহাড়ে উঠবার। ঠিক এই সময়ে মায়া মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল: ঐ গোম্ফা দেখতে যাবার ইচ্ছে হচ্ছে বুঝি?

নিজের পাশ থেকে এই প্রশ্ন শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম। তারপরে মায়াকে দেখতে পেয়ে হেসে ফেললাম। বললাম: কখন্ এসেছেন এখানে?

কেন আসতে নেই বুঝি!

আমি সে কথা বলছি না, কখন এসেছেন তাই জানতে চাইছি। অনেকক্ষণ এসেছেন বললে লজ্জা পাব।

মায়া বলল: তবে আপনি আমার প্রশ্নেরই জবাব দিন।

বললাম: আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি একজন সঙ্গীর কথা ভাবছিলাম. সঙ্গী পেলে পাহাড়ের উপরে একবার ওঠা যেত।

মায়া বলল: আপনার লামার দেখাও পাবেন ঐখানে।

সত্যি নাকি!

লামারা তো গোম্ফাতেই থাকে শুনেছি।

বললাম : তা থাকে, কিন্তু তাই বলে থেনডুপ লামাকে কি আর এই গোম্ফাতে পাব!

মায়া বলল : সত্যিই যদি সেখানে যেতে চান তো আমাকে বলুন। আমিই সে ব্যবস্থা করতে পারি।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম : আপনি যবেন নাকি?

মায়া একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করে বলল : মরে যাব।

আমি হেসে বললাম : তবে?

মায়াও হেসে বলল : যে লোক মরে যাবে না তেমন লোকই আপনার সঙ্গে যাবে। দোভাষীকে সঙ্গে নিয়ে উপরে উঠবার জন্যে কেউ কেউ তৈরি হচ্ছে।

গোম্ফা দেখবার জন্য আমার দু রকমের আগ্রহ ছিল। থেনডুপ লামার সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়, তাহলে ওর গল্পের শেষটুকু শুনতে পাব। দেখা না হলেও ক্ষতি নেই, একটা গোম্ফার অভ্যন্তর দেখতে পলে লামাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে একটা প্রত্যক্ষ ধারণা জন্মাবে আর থেনডুপ লামার জীবনের পরবর্তী কাহিনী আমি কল্পনা করে নিতে পারব। মায়ার কথায় উৎসাহ পেয়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম : ওদের সঙ্গেই তাহলে আমি গোম্ফাটা দেখে আসি।

মায়া আমার সঙ্গে চলতে চলতে বলল : লামাদের সঙ্গেও একটু আলাপ করে আসবেন।

নীচে থেকে মনে হয়েছিল যে এই গোম্ফায় উঠতে আমাদের অনেক কষ্ট হবে। কিন্তু উপরে পৌঁছে দেখলাম যে কষ্ট তেমন হল না। আধ-মাইলটাক পথ ক্রমাগত চড়াই, কিন্তু এ রকমের পথ অতিক্রম করার একটা অভ্যাস আমাদের হয়েছে। আরও একটি কারণে এই পথ আমার কাছে মূল্যবান মনে হল। এই পথেই আমরা তিব্বতের জীবনযাত্রার একটা পরিচয় পেয়ে গেলাম। পাহাড়ের গায়ে মৌমাছির চাকের মতো অসংখ্য গুহা দেখতে পেয়ে দোভাষীকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম : এগুলো কী?

এই প্রশ্নের উত্তরেই তিব্বতের দরিদ্র জনগণের কথা কিছু জানতে পেলাম। দোভাষী বলল : গরীব লোকের থাকবার জন্যে এগুলো গুহা। কতগুলো স্বাভাবিক, আর কতগুলো পাহাড় কেটে তৈরি। কোদাল আর শাবল দিয়ে মাটি কেটে আর পাথর সরিয়ে গরীবেরাই তৈরি করেছে।

কারা থাকে এখানে ?

চাষী মজুর ভিখিরি, কে না থাকে ! অনেক লামাও থাকেন।

আমি বললাম : লামারা তো গোম্ফার ভিতরে থাকেন শুনেছি।

দোভাষী বলল : গোম্ফায় তো সব লামার জায়গা হয় না। এ দেশে লামার সংখ্যার যে শেষ নেই। তাঁদের অনেকেই এই রকম পাহাড়ের গায়ে গুহায় বাস করেন। তাঁরা নিজেরাই নিজেদের গুহা তৈরি করে নেন পছন্দ মতো জায়গায়।

আমি তাকিয়ে তাকিয়ে গুহাগুলি দেখতে লাগলাম। কোনটির দরজা আছে কোনটির নেই, কোনটিরই সামনে পর্দার মতো কাপড় ঝুলছে। ইট কাঠ পাথর দিয়ে যারা ঘরবাড়ি তৈরি করতে পারে না দারিদ্র্যের জন্যে, তারাই থাকে এই সব গুহার ভিতরে। বিচি তাদের জীবনযাত্রা। আমার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।

দোভাষী আমার বিস্ময় লক্ষ্য করে বলল : পথের ধারে এমন গুহার ভিতরে তপস্বী মহাপুরুষও দেখতে পাওয়া যায়। সাধা মানুষের সঙ্গে নিতান্ত সাধারণ ভাবেই তাঁরা বাস করেন। সব স তাঁদের চেনাও যায় না।

সিংহদ্বার পেরিয়ে আমরা গোম্ফার ভিতরে ঢুকলাম। যাঁ দার্জিলিঙের নিকটে ঘুমের গোম্ফা দেখেছেন, কিংবা গ্যাংটে দেখেছেন সিকিমের মহারাজার প্রাসাদসংলগ্ন গোম্ফা, তাঁদের এ বৌদ্ধ গোম্ফা সম্বন্ধে কিছু ধারণা আছে। পুরাঙের শিমপি লী গোম্ফা কিছু অন্য ধরণের। এই গোম্ফায় অলি-গলি ও প্রদক্ষিণে পথ আছে অনেকগুলি। বড় সংকীর্ণ অন্ধকার সেই সব পথ, ব

সাবধানে যাতায়াত করতে হয়। দোতলায় উঠবার জন্যে কাঠের সিঁড়ি আছে, তারপরে ছাদ। সেই ছাদের উপর থেকে আমরা নিচের প্রাঙ্গণ ও উপাসনার ব্যবস্থা দেখলাম। একটি বেদীর উপরে বিরাট একখানি যবনিকা ঝুলছে, রেশমী কাপড়ের উপর নানা বর্ণের সুতোয় বোনা চিত্রপট। ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের চারি দিকে কয়েকজন অবতার, রাম-সীতা নরসিংহ চীনের ড্রাগন ও অন্যান্য অনেক মূর্তি। এক দিকে প্রধান লামার বেদী, অন্য দিকে লামাদের আসন পাতা আছে সারি সারি। চারি দিকে ঘুরে আমরা আরও অনেক কিছু দেখলাম। মানুষের মতো বিরাট আকারের ঢাক মাটিতে পোঁতা আছে দণ্ড দিয়ে, তার সঙ্গে দড়ি বাঁধা আছে। আমাদের দোভাষী সেই দড়ি টেনে ঢাকটা ঘুরিয়ে দিল। এই নিয়ম। আমরাও তাই করলাম।

ছোটখাট এমন অনেক জিনিস দেখলাম যা আমার কাছে বড় মনে হল না। আমার মন ছিল অন্য দিকে। আমি লামাদের দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। দেখলামও কয়েকজনকে। তাঁদের লাল পোশাক, শক্ত-সমর্থ কর্কশ চেহারা। মুখে প্রসন্নতার পরিবর্তে যেন ক্রূরতার প্রতিবিম্ব দেখলাম। কটমট করে আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, কিন্তু কোন কথা কইলেন না কারও সঙ্গে। দোভাষীর কাছে আমরা একটা নতুন কথা জানলাম। এই গোম্ফার বড় লামারা নাকি লাসা থেকে নির্বাচিত হয়ে আসেন, কিন্তু সারা জীবনের জন্যে আসেন না। সরকারী কর্মচারীর মতো তাঁদের মঠ থেকে মঠান্তরে বদলি হয়। এক একজন প্রধান লামা পাঁচ বছর করে এই গোম্ফায় আসেন, তারপর আর একজন নির্বাচিত হয়ে লাসা থেকে এলে তাঁরই হাতে গোম্ফার কাজ বুঝিয়ে দিয়ে লাসায় ফিরে যান। সে সময়ে নাকি গোম্ফায় একটা উৎসব হয়।

থেনতুপ লামার কাছে আমি যে কাহিনী শুনেছিলাম, তাতে আমার অন্য ধারণা হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম যে কোন গোম্ফার

প্রধান লামাই বুঝি তাঁর পরবর্তী প্রধান লামাকে নিজের গোম্ফায় লামার মধ্য থেকেই নির্বাচিত করেন। কিংবা লামারা তাঁর মতামত জানিয়ে পরবর্তী প্রধান লামা নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। এও হতে পারে যে দেশের সমস্ত গোম্ফার এক নিয়ম নয়। বড় বড় গোম্ফাগুলিই শুধু লামার নিয়ন্ত্রণাধীন, ছোট গোম্ফাগুলি এ সব ব্যাপারে স্বাধীন।

আর একজন বললেন, যাঁরা এলেন না, তাঁদের জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে।

আমার মনে হল, কোজর যো গেলে আমাদের অন্য ধরণের অভিজ্ঞতা হত। হিন্দু দেবদেবী নিয়ে বৌদ্ধ লামারা কী ভাবে পূজার্চনা করছেন, তা নিশ্চয়ই আরও কৌতূহলোদ্দীপক। আমাদের কাছে তা আরও আনন্দদায়ক হত।

আমি আশা করেছিলাম যে এই গোম্ফার ভিতরেই আমার থেনডুপ লামার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। নিজে লামা হয়ে সে পুরাঙের মণ্ডিতে রাত্রি বাস করবে না। আশ্রয় নেবে এইখানেই। তাই ছোট ছোট ঘরগুলোতে উঁকি দিয়ে দেখেছিলাম। নাকে এক রকমের উৎকট গন্ধ লেগেছে, সে নাকি ধূপের গন্ধ। চমরীর মাখনের গন্ধও হতে পারে। পিতলের দীপাধারে যে মাখন দেখেছি তা চমরীর। এ মাখন মোমের মতো শেষ পর্যন্ত জ্বলে। আমাদের দেশের মাখনের মতো নয়।

থেনডুপ লামাকে না দেখে আমি নিরাশ হয়েছিলাম। কিন্তু তার জন্যে অভিযোগ করার কিছু নেই। তবু আমার অভিমান হয়েছিল। মনে হয়েছিল যে তার এখানে থাকা উচিত ছিল। মানস সরোবরে পৌঁছবার আগেই আমাকে তার কাহিনীর শেষটুকু শোনান তার কর্তব্য ছিল।

অন্ধকার হবার আগে আমরা গোম্ফা থেকে নামতে পারলাম না। পথেই অন্ধকার হল। আমরা খুব সাবধানে পাহাড় থেকে নামতে

লাগলাম। সমতলের কাছাকাছি এসে আমি থমকে দাঁড়ালাম। বড় বড় পা ফেলে যে উপরে উঠছে, তার চলনটি আমার খুবই পরিচিত। থেনডুপ লামা নয় তো!

আমাকে চিনতে পেরে সেও দাঁড়াল। তারপর হাসল। সেই প্রসন্ন হাসি, শিশুর মতো সরল ও মিষ্টি। অন্ধকার বেশি হলে আমি সেই হাসি দেখতে পেতাম না। টর্চের আলোর পথ দেখা যায়, কিন্তু কারও হাসি দেখবার জন্যে তার মুখের উপরে সেই আলো ফেলা যায় না।

আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম। সেও গভীরভাবে আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরল। আমি বললাম: এখন আপনাকে কিছুতেই ছেড়ে দেব না।

থেনডুপ লামা কোন প্রতিবাদ করল না। অন্য যাত্রীরা এগিয়ে গিয়েছিলেন। সে আমার হাত ধরে আমার সঙ্গেই অগ্রসর হল।

বললাম: আপনার কাহিনী এখন এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে আপনাকে ছেড়ে দিতে মন চাইছে না।

লামা বলল: আজ আর একটা অধ্যায় আপনাকে বলব।

ঝড়ের মতো বাতাস বইছিল সারা দুপুর। সেই বাতাস এখন থেমে গেছে। এখন শীত আরও প্রবল হয়েছে। পরিশ্রমের জন্যেই শীত আমাদের কাবু করতে পারে নি। কোন উন্মুক্ত জায়গায় বসলেই শীতে জমে যেতে হবে। তাই বললাম: পথ চলতে চলতেই এই অধ্যায়টি আপনি বলুন।

অন্ধকারে আমি থেনডুপ লামার গল্প শুনলাম। অন্ধকারের মতোই ভয়ার্ত বিষণ্ণ কাহিনী। থেনডুপ লামা যে অত্যন্ত কষ্টে তার কান্না গোপন করেছিল, আমি তা বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু তাকে কোন সান্ত্বনা দিতে পারি নি।

ষোল

পরদিন সকালবেলায় কাজে বেরবার সময় থেনডুপের বুকটা দুরদুর করে উঠল। আজ এমন আয়োজন কেন! অনেকের কোমরেই আজ পিস্তল ঝুলছে। তাদের সামনে ও পিছনে আরও অনেকগুলো মোটর বাইক, রক্ষী-বাহিনীর জোয়ানরা চলেছে রাইফেল কাঁধে, ক্ষুদে মেশিনগানও সঙ্গে চলেছে। এরা কি আজ যুদ্ধ করতে যাচ্ছে!

কিন্তু উ কিঙ থেনডুপকে ডেকে বললেন, তুই আজ আমার পেছনে বসবি।

ভয়ে ভয়ে থেনডুপ বলল, ব্যাপার কী উ কিঙদা?

উ কিঙ বললেন, বোস্ আগে, তারপর বলছি।

যাত্রা শুরু করবার আগে উ কিঙ সমস্ত বাহিনীটি একবার দেখে নিলেন, তারপর একটা বাঁশি বাজালেন। সমস্ত মোটর বাইকগুলো এক সঙ্গে স্টার্ট দিল, চলতে শুরু করল একই সঙ্গে। থেনডুপ আশ্চর্য হয়ে দেখল যে আজ তাদের সঙ্গে জরিপের কোন সরঞ্জাম নেই। চিঙ লিঙকে পিছনে নিয়ে তাই ফুঙও চলেছে, তারাও কিছু সঙ্গে নেয় নি। এ তাদের বড় সাহেবের হুকুম, কিন্তু আজ তাদের কী করতে হবে সে কথা থেনডুপ এখনও জানে না।

চলতে চলতে থেনডুপ আবার উ কিঙকে জিজ্ঞাসা করল, আজ এমন আয়োজন কেন উ কিঙদা?

গম্ভীর ভাবে উ কিঙ বললেন, আজ তোদের গ্রামে ঢুকব।

থেনডুপ আশ্চর্য হয়ে বলল, তার জন্যে এত আয়োজন!

তা না হলে তোর গোম্ফার লামারা আমাদের খাতির করবে কেন!

থেনডুপের গ্রামে পৌঁছতে আরও কিছু পথ বাকি ছিল, যে

পথের কাজ শেষ করতে সময় লাগত আরও কয়েক দিন। থেনতুপ বলল, পথের কাজটুকু শেষ করে এগোলে ভাল ছিল না!

এ কথার উত্তরে উ কিঙ বললেন, তারপর তোর লামারা আমাদের ঘাড়ে এসে পড়লে কী হত!

তাই বলে কি আমরাই ওদের ঘাড়ে গিয়ে পড়ব!

তা ছাড়া উপায় কী! নিজেদের প্রাণ তো বাঁচাতে হবে।

তারপর সেই পুরনো গল্পটা তাকে আর একবার শোনালেন। পথের ধারে পাহাড়ের উপর যে গোম্ফাটা আছে, সেই গোম্ফার লামারা তাদের আক্রমণ করেছিল। লামারা যে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করতে পারে, এ-অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না, কোন দিন কোন সংশয় তাদের মনে উদয় হয় নি। নিশ্চিন্ত মনে সবাই কাজ করছিল। হঠাৎ এক সময় তারা হারে রে রে করে তেড়ে এল। একজন তুজন নয়, পঙ্গপালের মতো এক ঝাঁক লামা এক সঙ্গে এসে ঘাড়ে পড়েছিল। সেদিন কোমরে একটা পিস্তল থাকলেও ছেলেটা মারা পড়ত না।

থেনতুপ চমকে উঠে বলল, কোন্ ছেলেটা?

উ কিঙ গভীর ভাবে বললেন, তাই ফুঙের মতো একটা ছেলে। সেবারে আমরা পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছিলাম।

থেনতুপের মনে হল যে এরা আজ সেই হত্যার প্রতিশোধ নিতে চলেছে। গাড়িগুলো তাই এখন বিশ্রী গর্জন করছে। আর ঝাঁকছে বন্য জানোয়ারের মতো। থেনতুপের আজ খুব খারাপ লাগছে।

এক সময় কে প্রশ্ন করল, তোমরা কি আজ গোম্ফার উপরে গুলি চালাবে?

উ কিঙ এ-প্রশ্নের উত্তর দিলেন না দেখে বলল, একটা মানুষও তাহলে বাঁচবে না।

এবারে উ কিঙ আর চুপ করে থাকলেন না, বললেন, তোর মতো গাধা আমি দেখি নি। গায়ে পড়ে কেউ গুলি ছুড়তে যায়!

থেনডুপ ফোঁস করে উঠল, তবে কী করতে যাচ্ছ?

যাচ্ছি আমাদের শক্তি দেখাতে। তোদের গোম্ফার বাইরে দাঁড়িয়ে আমরা কুচকাওয়াজ করব, ফাঁকা আওয়াজ করব বন্দুকের, ভাল করে জানিয়ে আসব যে আমাদের আক্রমণ করলে বিপদ্ তাদেরই হবে। আমরা যে শত্রুতা করতে আসি নি, সে কথাটাও জানাতে হবে।

থেনডুপ আর কোন কথা কইতে পারল না। তার মন তখন অনেকটা পথ পেরিয়ে তার গ্রামে গিয়ে ঢুকেছে। কত দিন সে তার গ্রামে যায় নি। দিন নয় মাস। এই কয়েক মাসে পরিবর্তন হয়তো কিছুই হয় নি, কিংবা সমস্তরই পরিবর্তন হয়ে গেছে। কে জানে, কী দেখবে সেখানে গিয়ে। কেউ তার খোঁজ করেছিল কিনা, সে কথা তার জানবার খুব ইচ্ছা হল। আকাশের একটা তারা খসে গেলে যেমন করে হারিয়ে যায়, সেও তেমনি করে হারিয়ে যায় নি তো! বড় লামাও কি তাকে ভুলে যাবেন! আর শিতেনও যে তাকে খুব ভালবাসত তাকে হারিয়ে নিশ্চয়ই তার কিছু দিন কষ্ট হয়েছে। আর—না না, আর কারও কথা সে ভাববে না, আর কারও কথা ভাবা তার উচিত নয়। থেনডুপ তার মনটা গ্রামের কথা থেকে ফিরিয়ে এনে পথের উপরে নিবদ্ধ করল।

এই সংকীর্ণ পথ সোজা তার গ্রামে গেছে। পথের ধারেই ছ্যুতেনদের বাড়ি। এত দিনে ছ্যুতেন নিশ্চয়ই তাকে ভুলে গেছে। ভুলে যাওয়াই ভাল। এক দিনের একটা অবাঞ্ছিত ঘটনা তার জীবনকে কেন খণ্ডিত করবে! বিয়ে করে সে সুখী হলে থেনডুপও সুখী হবে। সে লামা, তারও সুখী হওয়া উচিত। ছ্যুতেনকে সংসারী দেখলে সে তাকে আশীর্বাদ করবে।

সহসা থেনডুপের মন যেন বেদনায় ভরে গেল। যেখানে তার শৈশব কাটল, কাটল তার প্রথম যৌবন, সেখানে আজ তাকে কেউ চাইবে না, তাকে ফিরে পেয়ে খুশীতে কারও মন ভরে উঠবে না।

বড় লামা কি আজও বেঁচে আছেন ! শিতেনকে ওরা গোম্ফা থেকে তাড়িয়ে দেয় নি তো ! আর ছ্যুত্যেন কি এখন সেই পাঁচটা ভাই-এর স্ত্রী হয়ে সংসারের ঘানি টানছে না !

উ কিও হঠাৎ সামনে থেকে চেঁচিয়ে বললেন, ছ্যুতেনের বাড়িটা আর কত দূর রে ?

থেনতুপ চমকে উঠেছিল। তারপর চারিদিকে চেয়ে আশ্চর্য হল। কখন যে তাদের গ্রামের সীমানার ভিতর ঢুকে পড়েছিল, সে তা খেয়াল করে নি। সেই উঁচুনিচু রাস্তা, সেই ক্ষেতখামার আর ঘরবাড়ি। ওই তো তাদের গোম্ফার চূড়া এইখান থেকেই দেখা যাচ্ছে। ওই তো, সবটাই এখন দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ছুটোছুটি করছে কারা ! লামাবাই তো মনে হচ্ছে ! না, ছুটাছুটি নয়, গোম্ফার ভিতর থেকে তাঁরা বেরিয়ে আসছেন, দেখছেন তাঁদের। এই গাড়িগুলোর বিকট শব্দ কি তাঁদের কানে পৌঁছেছে, না আগেই তাঁরা কোন খবর পেয়েছিলেন !

থেনতুপ দেখতে পেল, পাহাড়ের ধারে লামারা সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছেন, দেখছেন তাদের। খুব ছোট ছোট দেখাচ্ছে তাঁদের, চোখ মুখ দেখা যাচ্ছে না। আর এক সন্ধ্যার কথা থেনতুপের মনে পড়ল। সেদিন তাঁরা অন্ধকারে লুকিয়ে থেনতুপকে দেখছিলেন, থেনতুপ তাঁদের দেহ দেখতে পায় নি, দেখেছিল তাঁদের চকচকে চোখ। সেদিন তাঁদের শ্যেনদৃষ্টি দেখে থেনতুপ ভয় পায় নি, ছ্যুতেনের হাত ধরে স্বচ্ছন্দে গোম্ফা থেকে বেরিয়ে এসেছিল। আর সে সেখানে ফিরে যায় নি।

আজ সে তার লামার বেশে গোম্ফায় ফিরছে না, আজ সে দেশের একজন সাধারণ কর্মী। বুদ্ধের নয়, জনগণের সেবার ভার নিয়েছে সে। এই তপস্যাতেই সে বুদ্ধকে পাবে। বুদ্ধ তো স্বর্গে নেই, বুদ্ধ নেই বই-এর পাতায়, মানুষের মধ্যেই থেনতুপ তার বুদ্ধকে পাবে। উ কিওের কথার উত্তর দিতে থেনতুপ ভুলে গেল।

কিন্তু উ কিঙ ভোলেন নি। সামনে থেকে তিনি ধমক দিয়ে উঠলেন, কিরে, কথার উত্তর দিচ্ছিস না যে!

থেনতুপ তার চেতনার জগতে ফিরে এল, বলল, কিছু বলছ নাকি!

উ কিঙ বললেন, বেশ ছেলে বাবা, ছ্যাতেনের নাম শুনেই মাথাটা বিগড়ে গেল!

ছ্যাতেনের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে বুঝি! আমি তার খবর কী জানি!

খবর নয় রে গাধা, তার বাড়িটা কোথায়, তাই জিজ্ঞেস করেছি।

থেনতুপ ভয় পেয়ে বলল, কেন, সেখানে তোমরা কী করবে?

উ কিঙ একটা ভেংচি কেটে বললেন, ভাব করব তার সঙ্গে।

উ কিঙের মুখ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু কণ্ঠস্বর এমনই সংযত যে মনের ভাব বোঝা একেবারেই সম্ভব নয়। থেনতুপ তাই জবাব দিল, তাহলে এইখানেই থাম।

ঠিক বলছিস তো?

থেনতুপ তার হাত বাড়িয়ে বলল, ঐ তো ওদের বাড়ি।

উ কিঙ তার পকেট থেকে বাঁশি বার করে বাজালেন। সমস্ত মোটর বাইকগুলো এক সঙ্গে থেমে গেল। উ কিঙও থামলেন, তারপরে গাড়ি থেকে নেমে বললেন, চল্, তোর ছ্যাতেনকে একবার দেখে আসি।

চিঙ লিঙ আর তাই ফুঙও গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিল। চিঙ লিঙ হেসে বলল, আমাকে সঙ্গে নেবে না লামা?

উ কিঙ আর তাই ফুঙ তাদের গাড়ি দুটোকে পায়ার উপরে দাঁড় করিয়ে থেনতুপের কাছে এসে বললেন, চল।

থেনতুপ আশ্চর্য হয়ে তাদের মুখের দিকে একবার তাকাল। এ সমস্তই যে আগে থেকে স্থির হয়ে আছে, তা বুঝতে তার দেরি হল না। কিছু করবার নেই। বলবারও নেই কিছু। তাই

নিঃশব্দে সে এগিয়ে গেল। রক্ষীবাহিনীর লোকেরা তখন পথের ওপরেই কুচকাওয়াজের জন্য তৈরি হয়েছে।

বাড়ির ভিতর ঢুকে থেনডুপ বিস্মিত হল। কেউ কোথাও নেই, এ-বাড়িতে কেউ থাকে বলে তার মনে হল না। থেনডুপ চেঁচিয়ে ডাকল, পেমবা কাকা!

ভিতর থেকে কোন উত্তর এল না।

থেনডুপ আবার ডাকল, ছ্যাতেন!

এ-ডাকেরও কোন উত্তর নেই। কিন্তু থেনডুপের মনে হল যে ভিতর থেকে যেন একটা গোঙানির শব্দ এল, আর একটা ছায়া সরে গেল দরজার পাশ থেকে। পিছন ফিরে থেনডুপ দেখল যে, উ কিঙও এই শব্দ শুনতে পেয়েছেন, কিংবা দেখেছেন সেই ছায়াকে। উ কিঙ ইশারায় তাকে কোমরের পিস্তলের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। ঘরের ভিতরে ঢুকে থেনডুপ বলল, পেমবা কাকা, আমি থেনডুপ।

থেনডুপ!

দু চোখ বিস্ফারিত করে পেমবা বেরিয়ে এল। থেনডুপের পা থেকে মাথা পর্যন্ত বার কয়েক দেখেই জড়িয়ে ধরল তাকে। উ কিঙ তার কোমরের পিস্তল বের করে ফেলেছেন, আর পেমবার হাতে কোন অস্ত্র আছে কি না তাই দেখছেন মনোযোগ দিয়ে। তার মনে হল যে পেমবা বোধহয় থেনডুপকে বুকের উপরে পিষেই মেরে ফেলবে।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দুজনে দুজনকে ছেড়ে দিল। রুদ্ধ শ্বাসে তারা কথা কইল কয়েকটা, তারপরেই পাশের ঘরে ছুটে চলে গেল।

পেম লামা এই ঘরে মাটির উপরে শুয়ে আছেন, আর যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। থেনডুপ মাটিতে বসে তাকে জড়িয়ে ধরল, বলল, এ অবস্থা আপনার কী করে হল পেম লামা?

পেম লামা কোন কথা কইতে পারলেন না, আরও করুণ ভাবে গোঁ গোঁ করে থেনডুপের প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

থেনডুপ মুখ তুলে তাকাল চারি দিকে। তারপর প্রশ্ন করল, ছ্যুতেন কোথায় পেমবা কাকা?

ছ্যুতেন!

পেমবা এক মুহূর্ত যেন স্তব্ধ হয়ে রইল, তারপরে উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠল। শিশুর মতো সে কান্না আর থামতে চাইল না।

থেনডুপ দু হাতে তাকে ধরে একটা ঝাঁকানি দিল, বলল, ছ্যুতেন মরে গেছে।

কাঁদতে কাঁদতেই পেমবা বলল, মরলে তো বেঁচে যেত, লামারা তাকে জাদু করেছে।

থেনডুপ খানিকটা আশ্বস্ত হল। জাদুকে আর ভয় পায় না। ছ্যুতেনকে তাহলে রক্ষা করা যাবে। থেনডুপ বলল, কোথায় সে?

কাঁদতে কাঁদতেই পেমবা বলল, জানি নে। গোম্ফার ভিতরে বোধহয় লামারা তাকে লুকিয়ে রেখেছে।

কঠিন ভাবে থেনডুপ বলল, তুমি ভেবো না পেমবা কাকা, আমি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব।

তারপর পেম লামার কথা জিজ্ঞাসা করল, পেম লামার এ দশা কী করে হল?

থেনডুপের মনে হল, পেম লামা এ কথার উত্তর দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর একটি কথাও বোঝা গেল না। থেনডুপ পেমবার কাছে তাঁর কাহিনী শুনল।

দিন কয়েক আগের কথা। বাচ্চা শিতেন লামা এসে খবর দিয়েছিল, পেম লামাকে কেউ ধাক্কা দিয়ে পাহাড়ের উপর থেকে ফেলে দিয়েছে। গড়িয়ে তিনি নিচে পড়েন নি, পাহাড়ের গায়ে আটকে আছেন। কিন্তু অন্য লামারা কেউ তাকে তুলে আনবেন না, কী সব বদনাম রটিয়েছে তার নামে। বড় লামার কাছেও তারা এ খবর গোপন করেছেন।

চুপি চুপি শিতেন লামা গ্রামের অনেকের কাছে গিয়েছিল, কিন্তু কেউই এগোতে সাহস পায় নি।

থেনডুপ জিজ্ঞাসা করল, শিতেন বড় লামাকে কেন এ কথা বলে দিল না?

পেমবা বলল, ভয়ে। তাকে তারা মেরে ফেলবার ভয় দেখিয়েছেন। ফুরপা লামা এসে আমাদেরও ভয় দেখিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমার আর ভয় কিসের! বউটা তো মরেই গেছে, মেয়েটাকেও নিয়েছে কেড়ে। কোন ধার্মিক লামার সেবা করে যদি প্রাণটা যায় তো যাক, তাতেই আমার পাপের ক্ষয় হবে।

পেম লামা কিছু বলবার চেষ্টা করছিলেন। থেনডুপ খানিকটা বোঝবার চেষ্টা করে বলল, বোধহয় জল খাবেন।

পেমবা জল আনল না, বাঁশের চোঙায় করে খানিকটা ছাং আনল, আর অল্প অল্প করে সেই মদ তার মুখে ঢেলে দিল। এক চোঙা ছাং খেয়ে পেম লামা একটু বল পেলেন, কতকটা সহজ ভাবে পেমবাকে বাইরে যেতে বললেন। তারপর জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন নিজের দুর্ভাগ্যের কথা। থেনডুপ তার পাশে বসে গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সব কথা জেনে নিল।

দিন কয়েক আগেই তারা শুনতে পেয়েছিলেন যে চীনারা এক দিন হুট করে এসে পড়বে। বড় লামার কথা ওয়াঙচুক লামা কিছুতেই মানবেন না। তার ধারণা যে চীনারা এলে দেশ উৎসন্নে যাবে, বুদ্ধের অভিশাপ পড়বে সকলের উপর। গ্রামের সবাইকে তারা এই কথা বুঝিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। সবাই বিশ্বাসও করেছিল এই কথা। কিন্তু বড় লামা নিজেই বিপদ বাধালেন। তাকে যারা জিজ্ঞেস করতে এল, তিনি তাদের অন্য কথা বললেন। বললেন যে সে বিচার হয়ে গেছে। বুদ্ধ কী নির্দেশ দিয়েছেন, পেম লামাকে তোমরা জিজ্ঞেস কর।

অত্যন্ত কাতরস্বরে পেম লামা বললেন, বুদ্ধ তো আমাকে কিছু

বলেন না, আমি বড় লামার কথাই বলি। তিনি আমাকে যা শেখান আমি সেই কথা বলি।

থেনতুপ যেন আকাশ থেকে পড়ল। বলল, সেদিন তাহলে আপনি বড় লামার শেখানো কথা বলেছিলেন!

পেম লামা এ কথা মেনে নিলেন।

থেনতুপ বলল, আর সবাইকে তা বলে দিলেন?

পেম লামা বললেন, এ কথা কি কাউকে বলতে পারি! আমি যে তাহলে ভেড়া হয়ে যাব! তুমি বড় লামা হবে বলেই তোমাকে বললাম। এর পর থেকে তোমার কথা মতোই তো আমাকে চলতে হবে।

থেনতুপের বিস্ময়ের যেন আর শেষ নেই। কী বলবে, কী করবে, সে তা ভেবে পেল না।

পেম লামা বললেন, আমার কথা যেন কেউ জানতে না পারে। পেমবাকে তাহলে ওরা মেরে ফেলবে। আমাকেও।

থেনতুপ উঠে দাঁড়াল, বলল, দেখি কী করে ওরা আপনাদের মারে!

বলে বেরিয়ে এল। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে পেমবা কাঁদছিল। থেনতুপ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, তুমি কেঁদো না পেমবা কাকা, ছ্যাতেনকে নিয়ে আমি ফিরব।

কিন্তু থেনতুপ তার কথা রাখতে পারে নি। গোম্ফার ভিতর ছ্যাতেনকে সে খুঁজে পায় নি।

সতেরো

নদীর ধারে পৌঁছে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এইটুকু সময়ের মধ্যে আরও অনেক তাঁবু পড়েছে। ভারত থেকে ভোটিয়ারা এসেছে ব্যবসা করতে, তাদেরই তাঁবুতে নদীর ধার আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। আমি যাঁদের সঙ্গে গোম্ফা দেখতে বেরিয়ে ছিলাম, তাঁরা বোধহয় অনেক আগেই নিজেদের তাঁবুতে পৌঁছে গেছেন। আমরা ধীরে ধীরে হেঁটেছি, পথ চলার চেয়ে গল্পের দিকে আমাদের মন ছিল বেশি। থেনডুপ লামাকে আমি তাই জোরে হাঁটতে দিই নি। এবারে যখন ফিরে যেতে চাইল, আমি তাকে বাধা দিলাম, বললাম: গোম্ফায় ফিরে কী দেখলেন, সেই কথাটি আজ বলে যান।

থেনডুপ লামার বুকের ভিতর যে যন্ত্রণা হচ্ছিল, আমি তা বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু তবু তাকে মুক্তি দিতে চাই নি। নিজের দেশের মাটিতে একবার হারিয়ে গেলে আর তাকে আমি খুঁজে পাব না।

থেনডুপ লামাও বোধহয় আমার উদ্বেগের কারণ বুঝেছিল। তাই বলল: আমি বলতে পারি, কিন্তু এই শীতে আপনার কষ্ট হবে।

শীতে সত্যিই আমার হাত পা জমে যাচ্ছে। দিনের আলো মিলিয়ে যেতে না যেতেই আকাশ থেকে শীত নেমেছে। নদীর জল থেকেও যেন বরফের মতো ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। থেনডুপ লামাকে আমি আমাদের তাঁবুর মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু সেখানে সকলের সামনে সে তার গল্প বলবে না। তাই বললাম: কষ্টের চেয়ে আনন্দ পাব বেশি।

বলে পুরাঙের মণ্ডির দিকে অগ্রসর হলাম। অনেক দিনের পুরনো বাজার, অনেক দোকান পাট ঘর বাড়ি। তিব্বতীদের সঙ্গে ইংরেজও একবার যুদ্ধ করেছিল, তারপর এই দেশে বাণিজ্যের অধিকার পেয়েছে। এই শতাব্দীর প্রথম থেকেই বাণিজ্য চলছে,

মানস সরোবর ও কৈলাসের পথও খুলেছে ভারতীয়দের জন্য। হাঁটতে হাঁটতে নদীর তীর ছাড়িয়ে আমরা একটা চায়ের দোকানে এসে বসলাম। আর চা খেতে খেতেই শুনলাম থেনডুপ লামার অসমাপ্ত কাহিনী।

পেমবার বাড়ি থেকে থেনডুপ বেরিয়ে আসতেই উ কিঙ তাঁর বাঁশি বাজালেন। রক্ষী বাহিনীর কুচকাওয়াজ তখনই থেমে গেল, থেমে গেল বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ আর ব্রেনগানের খটখট শব্দ। মুহূর্তের জন্য সমস্ত নিস্তব্ধ হয়ে গেল, তারপরেই মোটর বাইকগুলো গর্জে উঠল। থেনডুপ এসে উ কিঙের পিছনে বসল। আবার যাত্রা।

এবারে তারা গোম্ফায় গিয়ে উঠবে। কিন্তু এই সমস্ত মোটর বাইক সেখানে উঠবে না। মোটর বাইক তাদের ঠেলে তুলতে হবে, কিংবা গাড়িগুলো নিচে রেখে পায়ে হেঁটে উঠতে হবে। থেনডুপের ভয় করছিল। লামারা কী ফন্দী এঁটেছেন, সে তা জানে না। উপর থেকে কি বড় বড় পাথর তারা গড়িয়ে দেবেন! কোন রকমে একটা পাথর গড়িয়ে দিতে পারলেই কয়েকজনের প্রাণ যাবে।

থেনডুপ ভাবছিল বড় লামা কী করবেন! তিনি কি তাঁর নিজের ঘরেই বসে থাকবেন, না বেরিয়ে আসবেন গোম্ফার বাহিরে! ওয়াঙ-চুক লামা ফুরপা লামা কি বড় লামার কথা শুনবে না! গোম্ফার ভিতরে আরও তো অনেক লামা আছেন, তাঁরাও কি বড় লামার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে! থেনডুপের দু কান গরম হয়ে উঠল, মনে হল যে গরমে তার সমস্ত শরীর ঘেমে উঠেছে। থেনডুপ কোনও কথা কইতে পারল না।

উ কিঙ বললেন, অত ভয় পাচ্ছিস কেন!

থেনডুপ বলেছিল, ভয় পাব কেন!

কিন্তু উ কিঙ সে কথা মানেন নি, বললেন, তোর মুখ দেখেই আমি বুঝতে পারছি।

থেনডুপ এবারে সত্যি কথা বলে ফেলল, ছ্যাতেনকে ওরা লুকিয়ে রেখেছে, আর বড় লামার জীবনও নিরাপদ নয়।

উ কিঙ গম্ভীর স্বরে বললেন, তুই বড় লামার কাছে যাবি, আর ছ্যাতেনকে খুঁজবে চিঙ লিঙ।

গোঁ গোঁ করে মোটর বাইকগুলো ছুটছে। ছুটছে নয়, লাফাচ্ছে। যেন একপাল বনের ইয়াক প্রাণপণে দৌড়চ্ছে। এদের গলায় ঘণ্টা নেই, আছে গোঙানি। এদের গলার ঘণ্টা সারাক্ষণ টিনটিন করে বাজে না। দরকার হলে এরা গাঁক গাঁক করে ডাকে। এই বিকট শব্দে থেনডুপের সমস্ত স্বপ্ন ফুরিয়ে গেছে।

গোম্ফার পথের কাছে পৌঁছে থেনডুপ চেঁচিয়ে উঠল, থামো।

উ কিঙ বাঁশি বাজাতেই সবাই থামলো।

উ কিঙ বললেন, সবাই পায়ে হেঁটে উঠবে, মেসিনগানের বাইক শুধু ঠেলে তোল।

গাড়ি থেকে নেমেই থেনডুপ বড় বড় পা বাড়িয়েছিল। বাধা দিয়ে উ কিঙ বললেন, আস্তে চল থেনডুপ, সবার সঙ্গে এক সঙ্গে উঠতে হবে।

বলে চিঙ লিঙের দিকে চেয়ে বললেন, গাধা কেমন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে দেখেছিস।

চিঙ লিঙ বলল, এ যে ওর নিজের রাজত্ব।

উ কিঙ বললেন, নিজের রাজত্বই বটে। আর কটা দিন এখানে থাকলে ওরও অবস্থা হত পেম লামার মতো। ওরে গাধা, পিস্তল চালানো তোর মনে আছে তো?

বলে থেনডুপের দিকে তিনি তাকালেন।

অন্যমনস্ক ভাবে থেনডুপ বলল, আছে।

গোম্ফায় পৌঁছে সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল। কোন দিকে জনমানব নেই, সাড়া-শব্দও আসছে না কোন দিক থেকে। দূর থেকে

যে লামাদের তারা দেখেছিল, এত অল্প সময়ে তারা কোথায় পালিয়ে গেল! থেনডুপ বলল, নিশ্চয়ই ওরা পাহাড়ের পিছনে গিয়ে লুকিয়েছে।

উ কিঙ বললেন, লুকোক তারা, তাদের কোন দরকার নেই।

থেনডুপ ছুটে গিয়ে গোম্ফার ভিতর ঢুকে পড়ল। বড় লামা নিশ্চয়ই কোথাও লুকোন নি, তাঁকে নিশ্চয়ই তাঁর ঘরে পাওয়া যাবে। পিস্তল হাতে তাই ফুঙ আর চিঙ লিঙ তার পিছনে ছুটল।

তারপর?

তারপর কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল, থেনডুপ কিছুই বুঝতে পারল না। প্রথমে সে একটা কান্না শুনতে পেয়েছিল। ভেবেছিল শিতেন বুঝি কাঁদছে, আর কেউ তাকে নিষ্ঠুর ভাবে মারছে। থেনডুপের মনে আছে, শিতেনের গলার স্বরও সে শুনতে পেয়েছিল, সে কাঁদতে কাঁদতেই বলেছিল, পারব না, পারব না আমি এ কাজ করতে। তারপরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল কোন অস্ত্র। মেঝের উপরে পড়ে ঝনঝন করে একটা শব্দ উঠেছিল।

তারপরেই থেনডুপ শুনেছিল দুটো গুলির শব্দ। একটা ভিতরে, আর একটা বাহিরে। একজন লামা ছুটে বেরিয়ে যাবার সময় হোঁচট খেয়ে দরজায় পড়ে গেলেন। থেনডুপের মনে হয়েছিল ফুরপা লামা, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝেছিল সে ফুরপা লামা আরও লম্বা, আরও ক্ষিপ্র। ফুরপা লামা হলে এমন করে সেখানে হোঁচট খেতেন না।

কিন্তু ভিতরে আর একটা গুলির শব্দ কেন হল!

থেনডুপ কিন্তু ভাববার অবকাশ পেল না। ভিতর থেকে গম্ভীর গলার আওয়াজ এল, থেনডুপ!

চমকে উঠে থেনডুপ বলল, উ কিঙদা!

উ কিঙ বললেন, বড় লামার কাছে এস।

বড় লামার ঘরে ঢুকে থেনডুপ স্তম্ভিত হয়ে গেল। রক্তে তাঁর ঘর ভেসে যাচ্ছে! মুখ থুবড়ে ও কে পড়ে আছে! ওয়াঙচুক লামা!

একখানা রক্তাক্ত ছুরি তাঁর হাত থেকে খসে পড়েছে। আর এ পাশে! বড় লামার বুকের উপর উপুড় হয়ে শিতেন কাঁদছে। এ ঘরে সে কখন এল! এই তো একটু আগে সে পাশের ঘরে তার কান্না শুনেছিল, আর কেউ মারছিল তাকে। এরই মধ্যে এত ঘটনা ঘটে গেছে! সে কি তবে ঘুমিয়ে পড়েছিল!

বড় লামার কাছে গিয়ে থেনডুপ চীৎকার করে কেঁদে উঠল, বড় লামা মরে গেছে! মেরে ফেলেছে বড় লামাকে! এত রক্ত কি বড় লামার বুক থেকে বেরিয়েছে।

পাগলের মতো থেনডুপ তাঁকে দু হাতে জড়িয়ে ধরল।

থেনডুপকে চিনতে পেরে শিতেন আবার কেঁদে উঠল, কী হবে থেনডুপদা?

থেনডুপ ভুল দেখে নি। গভীর বিস্ময়ে থেনডুপ দেখেছিল, বড় লামার ঠোঁট দুটো নড়ে উঠেছিল। থেনডুপের একটা হাত নিজের ডান হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বাম হাত দিয়ে তিনি কাউকে খুঁজেছিলেন। বড় লামা কি ছ্যাতেনকে খুঁজেছিলেন!

শিতেন তাই ভেবেছিল। সে বলছিল, ছ্যাতেন নেই। ফুরপা লামা তাকে নিয়ে পালিয়ে গেছে।

কোথায়?

শিতেন বলেছিল, সো মাফমের পথে। ফুরপা লামা বলেছেন, তুমি ধর্মের শত্রু, তুমি দেশের শত্রু। তাই তোমার কল্যাণের জন্যে তারা মানস সরোবরে তীর্থ করতে যাচ্ছেন।

বড় লামার বাম হাতখানা থরথর করে কেপে উঠেই বুকের উপর পড়ে গেল। আর সে হাত উঠল না। স্থির হয়ে গেলেন বড় লামা।

থেনডুপের পৃথিবীটা সেই দিনই অন্ধকার হয়ে গেছে। তার প্রেম গেল, তার ধর্ম গেল, তার দেশও গেল। কী নিয়ে সে এখন বাঁচবে।

থেনডুপ লামাকে আমি লক্ষ্য করছিলাম। দুরন্ত এক অতীতের মধ্যে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। এই জাগ্রত জগৎটা আর সে দেখতে পাচ্ছে না। আমি বলতে যাচ্ছিলাম, তারপর?

কিন্তু তার আগেই মিস্টার ধীরের হুঙ্কার শুনতে পেলাম: আপনি এইখানে!

পিছন থেকে হাসির শব্দ এল ভেসে। মায়া ধীর হাসছে।

আমি উঠে দাঁড়ালাম, বললাম: অনেক রাত হয়েছে বুঝি!

মিস্টার ধীর বললেন: রাতের চেয়ে ভাবনা হয়েছিল বেশি। আপনার সঙ্গীরা তো অনেকক্ষণ আগেই ফিরে এসেছেন! তাঁদের কাছে শুনলাম, আপনি এক লামার পাল্লায় পড়েছেন।

মায়া বলল: আমি তখনি বলেছিলাম যে নিশ্চয়ই থেনডুপ লামা।

কিন্তু থেনডুপ লামাকে আর দেখতে পেলাম না। অন্ধকারের মধ্যে সে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

নিজেদের তাঁবুতে আমরা ফিরে এলাম।

আঠারো

পরদিন প্রভাতে আমরা মানস সরোবরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। পথের পরিমাণ জানা হয়ে গেছে। দ্বিতীয় দিন রাবণ হ্রদে পৌঁছব, তার পরদিন মানস সরোবর, কৈলাস দেখতে পাব চতুর্থ দিন। কৈলাস পরিক্রমা করে পুরাঙে ফিরতে আমাদের দশ বারো দিন সময় লাগবে। পুরাঙে আমরা নতুন ঘোড়া ও ঝব্বু নিয়েছি, নতুন উৎসাহ সংগ্রহ করেছি। মায়া বলল : মিস্টার রায়কে আর একা ছেড়ে দেওয়া চলবে না, একা ছেড়ে দিলেই লামার পাল্লায় পড়বেন।

আমি বললাম : লামাদের এত ভয় কেন, তাঁরা তো ধর্মগুরু!

মায়া বলল : ভয় তো লামাকে নয়, ভয় আপনাকে। আপনিও লামা হয়ে গেলে কাকে নিয়ে ফিরব!

মিস্টার ধীর হেসে উঠলেন উচ্চ কণ্ঠে।

এই কথাতেই আমার থেনডুপ লামার কথা মনে পড়ল। সারা রাত আমি তার কথা ভেবেছি : ভারতে সে কেন এল, তার একটা কৈফিয়ৎ খুঁজে পাওয়া যায়। পরবর্তী জীবনে হয় তো সে চীনাদের বিরুদ্ধেই অভিযান করেছিল, এবং তিব্বত থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল অন্যান্য লামাদের সঙ্গে। কিন্তু তারপর এত দিন পরে সে কেন তার দেশে ফিরছে! মানস সরোবরে সে কি ছ্যুতেনকে খুঁজতে এল, না এমনি করে প্রতি বছরই আসে! তার আরও কোন গভীর উদ্দেশ্য আছে কি না, তাও বোঝা যাচ্ছে না। আর একবার তার সঙ্গে দেখা হলে এ সমস্ত কথা জেনে নেওয়া যেত।

মায়া বলল, দেখেছ ভাইসাহেব, লামার নাম শুনেই কী রকম হচ্ছে, লামাকে পেলে আর রক্ষা নেই। কৈলাস থেকে ওঁকে আর ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

আজ মন আমাদের অনেক হাল্কা হয়ে গেছে। এ পথে কঠিন চড়াই উৎরাই আর নেই। বর্ণালীর উপত্যকা ছেড়ে গ্রামের প্রশস্ত

শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি। সামান্য উঁচু নিচু পথ, চলতে কষ্ট হয় না একেবারে। যাত্রীরা বেশির ভাগই হেঁটে চলেছেন।

আরও একটা কারণে মন আমাদের হাল্কা আছে। সঙ্গে আমাদের সামান্য পয়সা কড়ি। মহাজনের কাছে যখন মিস্টার ধীর তিব্বতী তঙ্কা সংগ্রহে গিয়েছিলেন তিনি বলেছিলেন, পুরী পয়সা, সরোবঃ সাত্তু। তার মানে পুরী যেতে পয়সার দরকার, আর মানস সরোবরের জন্য চাই শুধু ছাতু। যাত্রীরা তাঁর কাছে টাকাকড়ি জমা রেখে সামান্য কিছু তিব্বতী তঙ্কা আধ ও সিকি তঙ্কা নিয়ে নিচ্ছিলেন। দোভাষীর পরামর্শে মিস্টার ধীরও রাজী হয়েছেন। মহাজনের কাছে সম্পদ নিরাপদ, কিন্তু মানস সরোবরের পথে আছে দস্যুভয়। মিস্টার ধীরের কিছু আপত্তি ছিল, শেষ পর্যন্ত শঙ্কর ভগবানের নাম করে সর্বস্ব জমা করে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করলেন। তার পরিবর্তে টাকার অঙ্ক লেখা একখানি কাগজ সংগ্রহ করে নিজের বুক-পকেটে রাখলেন। মিস্টার ধীরেরও আজ পথ চলতে হাল্কা মনে হচ্ছে। তাই মায়ার কথায় হেসে বললেন: আলমোড়ার হোটেলে তাহলে আমরা মুখ দেখাতে পারব না।

সত্যিই আর আমাদের পথ চলতে কষ্ট হচ্ছে না। গল্প পরিহাসে সহাস্যে আমরা পাশাপাশি চলছি। রুক্ষ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে এ পথ সোজা উত্তরে গেছে। দূরে দূরে পর্বতের শিখর দেখতে পাচ্ছি তুষারধবল এমনি একটি পর্বতের নাম গুরেলা মান্ধাতা। আমাদের পথ গেছে তারই পাশ দিয়ে রাবণ হ্রদের তীরে। তার পূর্বে মানস সরোবর। অনেক যাত্রীদল মানস সরোবরে না গিয়ে রাবণ হ্রদের তীরে তীরেই কৈলাসের পাদদেশে চলে যায়। ফেরার পথে দেখে মানস সরোবর। আমরা মানস সরোবর দেখে কৈলাসে যাব। মানসের পবিত্র জলে স্নান করে দর্শন করব দেবাদিদেব মহাদেবের লীলাভূমি কৈলাস।

মধ্যপথে আমাদের একটি রাত কাটাতে হল। কোন লোকালয়

নেই। আমরা নিজেরাই একটি লোকালয় সৃষ্টি করে তাঁবুর মধ্যে রাত্রিবাস করলাম। সন্ধ্যার পরে আর আমরা তাঁবুর বাহিরে আসি নি। পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি শুয়ে লেপ-কম্বলে সমস্ত দেহ আবৃত করে আমরা নিজেদের হৃদয়ের স্পন্দন শোনবার চেষ্টা করেছি। দুরন্ত বাতাস এসে তাঁবুর উপরে আছড়ে আছড়ে পড়েছে। তাঁবু উড়িয়ে নিয়ে যাবে বলে ভয় হয়েছে, কিন্তু এই ভয় দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। তার আগেই আমরা ক্লান্ত দেহে ঘুমিয়ে পড়েছি।

অতি প্রত্যুষে উঠে আবার আমরা যাত্রা করলাম। অসহ্য শীত, বাতাস আরও অসহ্য। সমস্ত গরম কাপড়ের বোঝা এখানে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, অসাড় মনে হচ্ছে হাত পা। পথ চলার পরিশ্রমেই খানিকটা আরাম পাচ্ছি। মাঝে মাঝে ঝর্ণার ধারা দেখতে পাচ্ছি। অঞ্জলি ভরে আমরা জল খেয়ে নিচ্ছি। ঝব্বুগুলো মাথা নিচু করে শুধু জলই খাচ্ছে না, জলের ধারে ধারে তৃণগুল্মেরও সন্ধান করছে। কাঁটার মতো শক্ত তৃণ। মাঝে মাঝে পাথরের ফাঁকেও এই রকমের কাঁটা দেখতে পাচ্ছি।

ঝর্ণার জল পেরবার সময় ঝব্বুগুলোকে সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে। ঘাস খাবার জন্যে মাথা এত নিচু করে যে পিঠ থেকে গড়িয়ে পড়বার ভয় হয়। দু-একজন যে পড়ে যায় না, তা নয়। পড়ে গেলে চোট লাগে, জামা-কাপড় ভিজে যায়, অন্য যাত্রীরা উপভোগ করে এই আকস্মিক পতন। আমরা সতর্ক হবার চেষ্টা করেও ভুলে যাই এই কথা। আর ভুললেই বিপদ।

এক সময় একটা চড়াই পথের সম্মুখীন হলাম। এ রকম চড়াই আমাদের পরিচিত নয়। এখানে এক জনের পিছনে আর একজনকে উঠতে হয় না, পাশের অতলস্পর্শী খাদে গড়িয়ে পড়বার ভয় নেই। এ চড়াই এমন প্রশস্ত যে সবাই পাশাপাশি উঠতে লাগলাম।

যাঁরা আমাদের আগে ছিলেন, সহসা তাঁদের আনন্দধ্বনি শুনতে পেলাম। চড়াইএর মাথায় তাঁরা পৌঁছে গিয়েছিলেন। মনে হল,

সামনে কোন অপরূপ দৃশ্য দেখে তাঁদের এই আনন্দ হয়েছে। আমারও তাড়াতাড়ি উপরে উঠতে লাগলাম।

দোভাষী কাছেই ছিল। সে বলল: ওপর থেকে রাক্ষসতালের নীল জল দেখা যাবে, আর মেঘে ঢাকা না থাকলে কৈলাসও।

রাক্ষসতাল রাবণ হ্রদেরই নাম। আমরা রাবণ হ্রদ বলি, আর হিমালয়বাসীরা বলে রাক্ষসতাল। তিব্বতীয়রা যে নামে ডাকে, তাও শুনলাম দোভাষীর মুখে—কেউ লাংচো বলে, কেউ বলে লা গাং। কিন্তু সবাই ভয় পায় এই রাক্ষসতালকে। এই সরোবরে নাকি রাক্ষসেরই বাস, এর জল পবিত্র নয়, এর তীর নয় নিরাপদ। চোরাবালিতে পা পড়লে মানুষকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। নরম সুন্দর শুভ্র বালির নিচেই জীবন্ত মানুষের সমাধি হয়ে যাবে।

চড়াইএর উপরে উঠে আমরাও সেই অপরূপ দৃশ্য দেখলাম। সামনে বাম দিকে দেখলাম খানিকটা নীল জল। আকাশের নীলের চেয়েও ঘন শান্ত স্নিগ্ধ। তারই পরপারে কৈলাসের অমল তুষার স্বল্প মেঘাবৃত। এই দৃশ্য দেখবার জন্য আমরা দিনের পর দিন হেঁটেছি, অপরিসীম কষ্ট সহ্য করেছি স্বেচ্ছায়। এখন চোখের সামনে এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে আনন্দে কলরব করে উঠতে ইচ্ছা হল। রাবণ হ্রদের তীরে পৌঁছবার জন্য আমরা দ্রুতপায়ে নামতে লাগলাম।

মনে হয়েছিল যে রাবণ হ্রদ এখান থেকে খুব কাছে। কিন্তু তা নয়। চলেছি তো চলেইছি। অনেকটা পথ অতিক্রম করে একটা জায়গায় এসে আমরা এই হ্রদের সমগ্র রূপ দেখতে পেলাম। দিনের আলো এখনও নিবে যায় নি, আলোয় রাবণ হ্রদ উদ্ভাসিত হয়ে আছে। জলের মধ্যে দুটি ছোট পাহাড় দেখতে পাচ্ছি দ্বীপের মতো। আলোয় রাঙা দেখাচ্ছে একটি, আর-একটির বিচিত্র বর্ণ। বাতাসে হ্রদের জল দুলছে, আমাদের মনও দুলে উঠল।

উপর থেকে তীরের কাছে নেমে আসতে আরও কিছুক্ষণ সময় লাগল। রাত্রিবাসের জন্য আমরা সেইখানেই তাঁবু ফেললাম।

অন্ধকার হবার আগেই আমাদের শয্যায় আশ্রয় নিতে হবে, তা না হলে এই বিশাল জলরাশির ধারে আমরা জমে বরফ হয়ে যাব।

ঝব্বুর পিঠ থেকে মালপত্র নামিয়ে তাঁবু খাটানো, রন্ধন ও আহারের ব্যবস্থায় আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। সে কাজটি সুসম্পন্ন দেখলেই আমাদের ছুটি। ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম শেষ করে আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করি আহারের জন্য আহ্বানের। এই অবসরে আমি একটু যাত্রীদের দেখে আসি। কথা হয় দু একজনের সঙ্গে। পরিচিতদের প্রশ্ন করি। সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা। হৈজাকি বেমারির ভয় ছিল হিমালয়ের পরপারে। ওলাউঠাকে তারা হৈজাকি বেমারি বলে। এ দিকে কারও সে ভয় নেই। এ দিকে জ্বর হয়। শীতে ও রুক্ষ বাতাসে হাত-পা-মুখ ফেটে রক্তাক্ত হয়, দম নিতে কষ্ট হয়, চলবার সময় বুকে টান ধরে। যাঁরা পদব্রজে চলেছেন, কষ্ট হলে তাঁরা পথের ধারে বসে পড়েন, কিংবা সঙ্গীর হাত ধরে চলেন ধীরে ধীরে। প্রয়োজন হলে কোন ঝব্বুবাহন যাত্রীকে অনুরোধ করতে হয় ঝব্বুটি ছেড়ে দিতে। ছেড়ে দিতেই হয়, সহযাত্রীর এই উপকার করে আনন্দ হয় মনে। এ পথের পরিচয় যে বড় অন্তরঙ্গ, নানা দেশের মানুষ হয়ে যায় এক পরিবারভুক্ত।

যাত্রীদের মধ্যে আজ রাবণ হ্রদ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। কেমন করে এই হ্রদের উৎপত্তি হল সেই আলোচনা। রামায়ণে আমরা এই কথা পড়েছি। বড় ভাই কুবেরকে জয় করবার জন্যে দশানন রাবণ এসেছিলেন কৈলাসে। তারপর তাঁকে পরাস্ত করে তাঁর পুষ্পক রথ নিয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন। এইখানে তাঁর রথের গতি রুদ্ধ হল। রথ থেকে নেমে রাবণ বললেন, ব্যাপার কী? সামনে ছিলেন শিবের অনুচর নন্দী, তিনি বললেন, দশানন, মহাদেব এখন পার্বতীর সঙ্গে ক্রীড়ারত, এ পথে যাবার অধিকার এখন কারও নেই। এই উত্তর শুনে দশানন রেগে উঠলেন, বললেন, এই পর্বতটাকেই আমি নিয়ে যাব। বলে তাঁর বিশ হাতে গোটা পর্বতটাকেই নাড়া দিলেন।

কৈলাস পর্বতবাসী শিবের সমস্ত অনুচর ভয় পেল, ভয় পেলেন পার্বতী। কিন্তু শিব সহাস্যে তাঁর পদাঙ্গুষ্ঠে পর্বতে একটু চাপ দিলেন। তাতেই দশানন হলেন প্রবল ভাবে পীড়িত। নিজেকে মুক্ত করবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি স্বেদাক্ত হলেন, দরদর ধারায় তাঁর ঘাম পড়তে লাগল। সেই ঘামেই উৎপত্তি হল এই রাবণ হ্রদের। কেউ বলেন, না। দশানন এখানে সহস্র বর্ষ রোদন করেছিলেন। তাঁর সেই সরব রোদনের জন্যই নিজের নাম হল রাবণ। আর তাঁর চোখের জলেই এই হ্রদের সৃষ্টি হল। রাবণ এখানে দীর্ঘ দিন তপস্যা করে শিবকে সন্তুষ্ট করেছিলেন।

এক জায়গায় যাত্রীদের মধ্যে তর্ক হচ্ছিল। আগে কৈলাস পরে মানস সরোবর, না আগে মানস সরোবর ও পরে কৈলাস। এখান থেকে রাবণ হ্রদের তীরে তীরেই কৈলাসের পথ সোজা চলে গেছে, কাল প্রত্যুষে যাত্রা করলে সন্ধ্যা বেলাতেই আমরা কৈলাসের পাদদেশে তারচেনে পৌঁছতে পারব। যাঁরা তীর্থকামী তাঁরা বললেন, মানস সরোবরে স্নান করে আমরা কৈলাসে যাব। লাগুক একটা দিন বেশি। এই বেশি সময়টুকু জমার পাতাতেই পড়বে।

দোভাষীর মুখে আমরা কৈলাস পরিক্রমার কথাও শুনলাম। প্রত্যুষে এখান থেকে যাত্রা করলে সন্ধ্যার প্রাক্কালে তারচেনে পৌঁছনো যায়। কিন্তু মানস সরোবরে সন্ধ্যাবন্দনা করে বেলায় যাত্রা করলে তারচেনে পৌঁছতে একদিন সময় বেশি লাগে। একটা রাত শতদ্রু নালার উপরে অতিবাহিত করতে হয়। শতদ্রু নালার কথা আমরা বুঝতে পারি নি। দোভাষী বুঝিয়ে বলল যে মানস সরোবর থেকে একটি নালা পশ্চিমবাহী হয়ে রাবণ হ্রদে পড়েছে। তিব্বতে এটি শতদ্রু নদী বলেই পরিচিত। এই নদীটি আবার রাবণ হ্রদ থেকে বেরিয়ে তীর্থপুরীর পাশ দিয়ে পাঞ্জাবে প্রবেশ করেছে। রাবণ হ্রদের চেয়ে মানস সরোবরের উচ্চতা প্রায় বিয়াল্লিশ ফুট বেশি, সমতল থেকে পনর হাজার আটানব্বুই ফুট। আমরা কৈলাস

পরিক্রমার পথে আঠারো হাজার ছশো ফুট উঁচুতে গৌরীকুণ্ড দেখব, আর কৈলাস প্রায় বাইশ হাজার ফুট উঁচু।

পরিক্রমার আরম্ভ হয় তারচেন থেকে, তিরিশ মাইল পথ তিন দিন সময় লাগে। কষ্টসহিষ্ণু হলে দু দিনেই এই পথ অতিক্রম করে তারচেনে ফিরে আসা যায়। যারা রাবণ হ্রদের তীর ধরে যায়, তারা ফেরে মানস সরোবরের ধার দিয়ে। আর যারা মানস সরোবর হয়ে যায়, তারা রাবণ হ্রদের ধার দিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে।

কৈলাস তিব্বতীদেরও পরম তীর্থ। বলে খাঙ রিমপোছে। বার বছর পর পর কুম্ভের মতো যোগ আসে। তখন সমগ্র তিব্বত থেকে ধার্মিক লামারা আসেন কৈলাস দর্শনে। সাধারণ তিব্বতী আসে মানৎ করে, দণ্ড খেটে, ভূমি মেপে তারা কৈলাস পরিক্রমা করে কুড়ি বাইশ দিনে। গৌরীকুণ্ডের বরফের ধারে কেন জমে যায় না, সেই কথা ভেবে আশ্চর্য হতে হয়।

এই মানস সরোবরের চারি দিকে ও কৈলাস পরিক্রমার পথে অনেক গোম্ফা আছে বৌদ্ধ লামাদের। লামাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় সেই সব গোম্ফায়। তীর্থযাত্রী তিব্বতীদেরও সাক্ষাৎ মেলে। আর দেখা হয় তিব্বতী দস্যুদের সঙ্গে। কাঁধে গাদা বন্দুক নিয়ে ঘোড়ায় চেপে তারা আসে। যাত্রীদের মালপত্র পরীক্ষা করে দেখে, জিজ্ঞাসাবাদ করে দোভাষী হুনিয়া বা ভোটিয়াদের সঙ্গে। তারপর বন্দুক বা পিস্তলের সংবাদ পেলেই তারা সরে পড়ে।

দোভাষী বলে, অপূর্ব দৃশ্য এই গৌরীকুণ্ডের। আধমাইল পরিধির এই কুণ্ডটি সারা বছরই বরফে আচ্ছন্ন থাকে। উপরের পুরু বরফ ভেঙে জল পাওয়া যায়। তীর্থযাত্রীদের কেউ কেউ স্নান করেন এই কনকনে ঠাণ্ডা জলে, শিশিতে জল ভরে নেন। বেশিক্ষণ দাঁড়ানো এখানে নিরাপদ নয়, তুষারের স্রোত বয়। কিছু দিন আগে এলে নাকি চার পাঁচ মাইল পথ বরফের উপর দিয়ে হাঁটতে হত। গৌরীকুণ্ডকে তিব্বতীরা বলে দোল্‌মা-লা।

অনেকের কাছে অনেক গল্প শুনলাম। কৈলাসের ছবিও দেখলাম একজন যাত্রীর কাছে। বরফের একটি বিরাট স্তূপ গোলাকার থ্যাবড়া শিবলিঙ্গের মতো। তারই পাশ দিয়ে বরফের পাহাড় এসেছে নেমে, তার নাম পিনাক। এই পিনাক এসে গৌরীকুণ্ডের প্রান্তে মিলেছে। অপরূপ তার শোভা।

আমি যখন নিজেদের তাঁবুতে ফিরলাম, সবাই তখন আমার অপেক্ষা করছেন। মায়া একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার ভাণ করে বলল: ফিরলেন তাহলে!

আমি বললাম: আমার কি ফেরার কথা ছিল না?

মায়া বলল: এখানে যে কোন লামা নেই সে খবর আমরা নিয়ে এসেছি। তাইতেই কতকটা নিশ্চিন্ত ছিলাম।

বাইরে হঠাৎ কোলাহল শোনা গেল। ডাকাতি পড়েছে নাকি! একটু আগেই তো আমি ডাকাতের কথা শুনে এলাম! আমার সঙ্গে মিস্টার ধীরও বেরিয়ে পড়লেন। মিস্টার মাথুর লেপের তলা থেকে বললেন: ব্যাপারটা কী?

ডাকাত নিশ্চয়ই নয়। কেন না কোন যাত্রীর মুখেই উদ্বেগ দেখলাম না, দেখলাম আনন্দ। প্রশ্ন করে জানলাম যে আকাশে চাঁদ উঠেছে, আর রাবণ হ্রদের জলে সেই দৃশ্য দেখবার জন্য তাঁবুর ভিতর থেকে সবাই বেরিয়ে পড়েছেন। হ্রদের নীল জলে চাঁদের কিরণ ঝিকমিক করছে, ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে পাড়ে, আর দূরে স্বপ্নের মতো আচ্ছন্ন দেখাচ্ছে গুরেলা মান্ধাতার তুষারাবৃত শিখর।

শীতের দাপটে স্থির হয়ে দাঁড়ানো যাচ্ছে না, আবার তাঁবুর ভিতরে ফিরে আসতেও চাইছে না অবাধ্য মন। যাত্রীদের কেউ কেউ ছুটোছুটি করছিলেন, কেন করছিলেন তা বুঝি। পরিশ্রম করে দেহটা গরম রাখবার প্রয়োজন হয়েছে।

মিস্টার ধীর তাঁবুতে ফিরে গেলেন, কিন্তু আমি ফিরতে পারলাম না। খানিকক্ষণ পরে মায়া এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল।

উনিশ

মানস সরোবরে যাত্রার সময় নিয়ে আমাদের খানিকটা বচসা হয়েছিল। এখান থেকে শুনেছিলাম ঘণ্টা তিনেকের পথ। তাই কেউ বললেন, সকালবেলায় উঠেই যাত্রা করব।

আবার কেউ বললেন : রোজ শেষ রাত্রে উঠব না। কাল আমরা এখানে খেয়েদেয়েই যাত্রা করব।

বচসা থেকে বিবাদ বাধত। সেটা এড়াবার জন্যে আমি বললাম : দুটোই করব।

সে আবার কী রকম ?

বললাম : কাল আমরা দেরিতে উঠে ব্রেকফাস্ট করব। আর লাঞ্চ খাব মানস সরোবরে স্নান করবার পর।

মায়া আর্তনাদ করে উঠল : না না, আমি পারব না অমন ঠাণ্ডা জলে নামতে !

লেপের তলা থেকে মিস্টার মাথুর বললেন। মানুষ খুন করার ব্যবস্থা করবেন না যেন।

শেষ পর্যন্ত তাই হল। গরম চা খেয়ে একদল যাত্রী এগিয়ে গেলেন। কেউ রওনা হলেন কিছু না খেয়েই। মানস সরোবরের জলে স্নান তর্পণ না করে তাঁরা জলস্পর্শ করবেন না। আমরা যাত্রা করলাম সকলের পরে। দোভাষী বলল : সকলের আজ ভাগ্য ভাল, তাই সময়মতো রওনা হওয়া গেল।

মিস্টার ধীর বললেন : ভাগ্যর সঙ্গে যাত্রার সম্বন্ধ কী ?

দোভাষী সহাস্যে বলল : খুব গভীর সম্পর্ক আছে। ঝব্বু গুলো প্রায়ই এখানে হারিয়ে যায়। রাত্রে চরতে গিয়ে সকালে আর ফিরে আসে না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখা যায় যে তারা

দল বেঁধে ঐ পাহাড় থেকে নেমে আসছে। খবর না ফিরলে তো রওনা হতে পারবেন না।

মিস্টার ধীর এ কথা মেনে নিলেন।

দোভাষীর কাছে আমরা আর একটা খবর পেলাম। তিব্বতে এখন নাকি লামাদের আধিপত্য আর নেই, চীনারাই দেশ শাসন করছে। চীনের সঙ্গে ভারতের মৈত্রী আছে বলেই আমরা নির্বিবাদে এখানে আসতে পেরেছি। কিন্তু এই মৈত্রী যে দীর্ঘস্থায়ী হবে না, সেদিন আমরা তা বুঝতে পারি নি। এই ভ্রমণের অনেক পরে চীনা ড্রাগন তার নিজ মূর্তি ধারণ করেছে। ভারতের সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়েছে তিক্ত, রুদ্ধ হয়ে গেছে মানস সরোবর ও কৈলাসের পথ। চীন ও ভারত এখন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শক্তির পরীক্ষা দিচ্ছে। কোন দিন যে এ অবস্থা আসবে, সেদিন আমরা ভাবতে পারি নি।

থেনতুপ লামা বোধহয় কিছু বুঝতে পেরেছিল। তা না হলে অমন ভগ্নোদ্যম হয়ে ভারতে পালিয়ে আসত না, জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল বলে দুঃখও করত না। পথ চলতে চলতে আমার মনে হল যে থেনতুপ লামার প্রাণের আগুন আজও নিবে যায় নি, আজও সেই আগুন জ্বলছে অনির্বাণ শিখায়। সেই আগুনই তাকে তিব্বতে টেনে এনেছে। মানস সরোবরে তীর্থ করতে সে নিশ্চয়ই আসে নি, সে এসেছে তার চেয়ে মহৎ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে। সেই উদ্দেশ্যের কথা সে আমার কাছেও গোপন রেখেছে।

রাবণ হ্রদ থেকে মানস সরোবরের দূরত্ব মাত্র এক-দেড় মাইলের। কিন্তু মাঝখানের পথ সমতল নয়। দু তিনটে চড়াই অতিক্রম করতে হয়। এখানকার সমস্ত পর্বত বৃক্ষলতাহীন, সবুজের লেশমাত্র দেখতে পাওয়া যায় না। তাই এই মরুভূমির মতো বিশাল প্রান্তরে পর্বত বেষ্টিত সরোবরের নীল জল দেখতে পেলে আনন্দে সমস্ত মন ভরে যায়। একটি একটি করে আমরা তিনটি চড়াই অতিক্রম করে বেলা দ্বিপ্রহরে পৌঁছলাম মনাসের তটে। গভীর বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে

আমরা কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। এ রূপের তুলনা নেই। এ যেন প্রকৃতির একটা বিরাট নগ্ন রূপ, নিরাবরণ পৃথিবী এখানে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে বিশ্রামরতা। ভোগের বাসনা এখানে জাগে না, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মতো আজীবন তপস্যার কথা মনে আসে।

চড়াই-এর উপর থেকে জলের ধারে পৌঁছতে আমাদের অনেক সময় লাগল। একটা রাত্রি আমরা এখানেই থাকব। তাঁবু খাঁটিয়ে রান্নার আয়োজন শুরু হল। আমি এই অবসরে কাপড় বদলে মানসের জলে নেমে পড়লাম। ঠাণ্ডা জলে স্নান করার কায়দা আমি শিখে ফেলেছি। জলে নেমে আর ইতস্তত করি না। তরতর করে এগিয়ে গিয়েই দু তিনটে ডুব দিয়ে উঠে আসি। সমস্ত শরীর এক সঙ্গে অবশ হয়ে যায়, তারপর তৃপ্তিতে মন যায় ভরে।

আমার সাহস দেখে মিস্টার মাথুর আশ্চর্য হলেন, বললেন: বলিহারি আপনার দুঃসাহস।

আমি উত্তর না দিয়ে শুধু হাসলাম, আর দেখিয়ে দিলাম অন্যান্য যাত্রীদের যাঁরা আগেভাগে এসে স্নান-তর্পণ সেরে এখন সন্ধ্যা বন্দনা করছেন বালির উপরে। ঝড়ের মতো বাতাস বইছে, আর তরঙ্গের পর তরঙ্গ এসে পাড়ের উপর আছড়ে পড়ছে। সমুদ্রের মতো গর্জন এখানে নেই, আছে একটা গানের মতো মিষ্টি সুর, কুবেরের পুরী থেকে যেন সঙ্গীতের ধ্বনি ভেসে আসছে।

অনেকে এই মানস সরোবর সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করছিলেন। এর গভীরতা কত, পরিধি কত, কতদিন লাগে পরিকক্রমা করতে, এই সব। আমাদের দোভাষীর এ সব তথ্য জানা। বলল: যেখানে সব চেয়ে গভীর সেখানটা প্রায় আড়াই শো ফুট। আর পরিধিটা ঠিক জানা যায় না। কেউ বলেন পঞ্চাশ মাইল, কেউ একশো মাইলও বলেন। তিব্বতীরা পাঁচ ছ দিনে এই হ্রদের পরিক্রমা করে বলে ষাট মাইল পরিধি বলে মনে করা খুবই সঙ্গত। ওরা

মানস সরোবরকে সো মাফম্ বলে, আর সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ মনে করে এই সো মাফম্।

মানস সরোবরের হাঁসের কথা আমার মনে পড়ল, আর সোনা'র পদ্মের কথা। রামায়ণ মহাভারত ও সংস্কৃত কাব্যে এই সব কথা পড়েছি। পিতামহ ব্রহ্মার মানস থেকে উৎপন্ন এই সরোবরে সোনার রঙের সৌগন্ধিক পদ্ম পাওয়া যেত। দ্রৌপদীর প্রার্থনায় ভীম এসেছিলেন সেই পদ্মের অন্বেষণে। তখন রাজহাঁসের চেয়েও বড় হংস দম্পতি এখানে বিহার করত। আর কুবেরের পুরী থেকে ঘটমূলের পাশ দিয়ে নেমে আসত স্নানার্থিনী বরাঙ্গনারা।

মানসের জলে এখন সোনার পদ্ম ফোটে না, কেলি করে না হংস-দম্পতি, স্নানার্থিনী কোন নারী আজ এখানে নিত্যস্নানে আসে না। যে বটগাছের নিচে তারা আশ্রয় নিত, সে বটগাছও আজ আর বেঁচে নেই। আজ আমাদের মতো যা ী ক্বচিৎ কদাচিৎ আসে এই দুর্গমতম তীর্থে।

দোভাষী আমাকে বলল : দেখতে পাচ্ছেন ?

আমি বললাম : কী ?

দোভাষী বলল : মানস সরোবরের প্রাণী দেখুন—ঐ হাঁস আর সারস, আর এ দিকে কিছু তিলের গাছ।

মানসের হংস নয়, রাজহাঁসও না। আমাদের দেশের বেলেহাঁসের মতো এক রকমের হাঁস আর সারসের মতো এক রকমের পাখি স্বচ্ছ নীল জলের উপর আহারের অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে।

দুপুরের আহারের পর আমরা একটু চোখ বুজে বিশ্রাম করেছিলাম। তারপর বিকেলে চা খাবার সময় মায়াকে আর দেখতে পেলাম না। মিস্টার ধীর ব্যস্ত হয়ে চারি দিক খুঁজে এলেন। কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না। মিসেস ধীর বললেন : ওকে একটু একা থাকতে দাও।

আমার মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন দপ করে জ্বলে উঠল, কেন! কিন্তু অসৌজন্য প্রকাশ পাবে ভয়ে সে প্রশ্ন করার সাহস পেলাম না।

চা খেয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি মানসের তীরে অনেক দূর এগিয়ে গেলাম। তারপর আরও অনেক দূরে দেখতে পেলাম দুটি মানুষকে। র্তিব্বতী নরনারী আরও একটু এগিয়ে গিয়ে আমি মানুষ দুটিকে চিনবার চেষ্টা করলাম। থেনডুপ লামা নয়তো! কিন্তু তার সঙ্গে ঐ মেয়েটি কে! ছ্যুত্তেন! থেনডুপ কি এখানে এসে তার ছ্যুত্তেনের দেখা পেয়েছে! মন আমার আনন্দে দুলে উঠল।

কেন জানি না, আমি আর এগোতে পারলাম না। আমি ফিরে এলাম।

মিস্টার ধীর এখনও ব্যস্ত ভাবে পায়চারি করছিলেন। আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন: পেলেন মায়াকে?

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম: এখনও ফেরে নি।

মিস্টার ধীর বললেন: আমি এই রকমই আশঙ্কা করেছিলাম। এত বড় একটা লেক দেখে মেয়েটা পাগল হয়ে না যায়!

আমার কৌতূহল আর বাধ মানল না, বললাম: কেন বলুন তো?

মিস্টার ধীর যা বললেন, তা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এমন একটি লেকের ধারে মায়া তার জীবনের সঙ্গীকে হারিয়েছে। সে লেক ভারতবর্ষে নয়, সে লেক সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখ শহরে। যে ভদ্রলোককে মায়া ভালবেসেছিল সে হারিয়ে গেছে জুরিখ লেকের ধারে একটি ইতালিয়ান মেয়ের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে। খুব অল্প দিন আগে এই ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু মায়া এ ঘটনা মনে রেখেছে বলে স্বীকার করে না। মায়াকে তো আমিও অনেক দিন দেখছি, মায়ার মনে কোন দুঃখ আছে বলে আমি কোন দিন সন্দেহ করি নি।

পূর্বের দিগন্ত থেকে অন্ধকার নামল ধীরে ধীরে। কিন্তু মায়া এখনও ফিরল না। দোভাষীকে সঙ্গে নিয়ে মিস্টার ধীর বেরিয়ে পড়লেন। বালির উপরে তাঁর টর্চের আলো ঝকমক করে উঠল।

আমি অন্য দিকে গেলাম। যেদিকে থেনডুপ লামাকে দেখেছিলাম ছ্যাতেনের সঙ্গে সেই দিকে। কিন্তু আমার জন্যে যে এমন বিপুল বিস্ময় সঞ্চিত ছিল তা জানতাম না। ছ্যাতেন নয়, মায়া ফিরছিল থেনডুপের সঙ্গে। দুজনের মুখেই প্রসন্ন হাসি, যেন জীবনের অর্থ তারা খুঁজে পেয়েছে।

আমি এক পাশে সরে দাঁড়িয়েছিলাম কিন্তু ওরা আমাকে চিনতে পেরেছিল। মায়া এগিয়ে এসে বলল: আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছেন বুঝি!

তার তিব্বতী পোশাকের দিকে চেয়ে আমি কী বলব ভেবে পেলাম না। মায়া হেসে বলল: পুরাঙের মণ্ডিতে এটা কিনেছি দিল্লীতে কাজে লাগবে। কেমন মানিয়েছে বলুন তো?

আমি তো তিব্বতী মেয়ে বলেই ভুল করেছিলাম। তাই না থেনডুপ লামা?

কিন্তু কোথায় থেনডুপ লামা! অন্ধকারে সে তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে। জীবনের পথে সে নিঃসঙ্গ। ক্ষণিকের সঙ্গীকে সে ভয় পায়। ছ্যাতেন সেজেও মায়া তাকে ভোলাতে পারবে না।

সমাপ্ত